

Research Section



(চতুর্বেদের সংক্ষিপ্ত-সার !)

পৃষ্ঠনৌর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাম লাহিড়ী শর্মা
কর্তৃক
সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত ।

প্রকাশক—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ।
'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা) ।

জ্ঞান-বেদ ।

— ● —

B7848

विषय-सूची ।

— — — • — —

[এই জ্ঞানবেদে যে সকল বিষয় সম্বিল্প হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।]

ବିଷୟ ।

ପୃଷ୍ଠା ।

- ১। 'ধর্মভাবোদ্ধীপক পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞাপক' ... ১৫০ পৃষ্ঠা।
(এই অংশে জ্ঞান জড়ি ও কৰ্মের স্মরণ এবং উগবস্তুত
অধিগত হইবে)।

২। 'বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা' ১৫০ পৃষ্ঠা।

(वेदमन्त्रसूह किंकरण अवस्थास्त्रर आंशु हैंडा किंकरण
अनिष्ट-साधक हैंडा है, एই अंशे ताहा बोधगम्य
हैंडे) ।

৩। ‘জ্ঞাপ্য বেদ-মন্ত্র-সমূহ’ ১০০ পৃষ্ঠা।

(ବିଧିପୁର୍ବକ ଅପ କରିଲେ କି ମତ୍ତ କି ଫଳ ପ୍ରସାନ କରେ,
ଏହି ଅଂଶେ ଡାହା ଉପଲବ୍ଧ ହିଲେ) ।

৪। ‘আধি-ব্যাধি-নাশের উপায়-পরম্পরা’ ... ১০০ পৃষ্ঠা।

(कोनूँ नस्ते कि आधिकारिक नाम हय, एहे अंशे ताहा
अध्यात हईगाहे)।

৫। ‘প্রস্তুতাত্ত্বিক গবেষণা’ ১০০ পৃষ্ঠা।

(ପ୍ରାଚୀନକାଳେର ସାମାଜିକ, ରାଜ୍ୟନୈତିକ ଓ ଅଧ୍ୟୈତିକ ଅନୁଭବ ତଥେର ପରିଚୟ ଏହି ଅଂଶେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଁଗାଛେ) ।



সূচনা ।

— o —

শাস্তিনিলয়
অশাস্তির
কারণ ।

শাস্তিনিলয় অনন্ত-জ্ঞানভাণ্ডার বেদ—সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণায় অধিগত হয় না। কালবশে কর্ম-বৈজ্ঞান্যে মানুষ সে সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। অধ্যবসায় নাই; অনুসঙ্গিঃসা নাই; শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে; স্বতরাং মানুষ সে জ্ঞান-বারিধিতে অবগাহন করিতে সমর্থ হইবে কিরিপে! পুরোভাগে বিশাল বিস্তৃত অনন্ত সমুদ্র জ্ঞানিয়া, ছুরধিগম্য-বৌধে; দূর হইতেই যে জন প্রত্যাবৃত্ত হয়; সমুদ্র-বিষয়ে সে অজ্ঞই রহিয়া যায়! বেদ কি এবং কি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, তাহা বুঝিবার পূর্বেই যাহারা হতাশে ফিরিয়া আসে, তাহাদেরও সেই অবস্থাটি ঘটিয়া থাকে। স্বতরাং অনন্ত-শাস্তিনিলয় বেদ বিশ্বান থাকিতেও ইহ-সংসারে মানুষের অশাস্তির অবধি নাই।

* * *

সংসারের অশাস্তি নিবারণের জন্য, শান্তিময় বেদ-জ্ঞান
দৃষ্টি-বিদ্ব। প্রতিষ্ঠা-কল্পে, লোকহিতুর খৰ্ষ-মহৰ্ষিগণ কর্তৃ-
পকারে যে বেদজ্ঞান-প্রচার-পক্ষে প্রচেষ্টা করিয়া
গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। আজ্ঞাণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, স্মৃতি,
দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শান্তিগ্রহ-সমূহ—সেই বেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্মই সংসারে
প্রবর্তিত হয়। অবতার-কল্পে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান् কর্তবারই কর্তৃকল্পে
বেদজ্ঞান সংসারে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন! মোহমুঝ জীব, মোহবশে সে
সকলই বিস্মৃতির অন্তরালে অন্তরিত করিয়াছে। পরম্পর জ্ঞানের আলোক
অজ্ঞানের আধারে আবৃত হইয়াছে;—সত্যের জ্ঞ্যাতিঃ অসত্যের কুহেলিকায়
আচ্ছম হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ এক দেখিতে আর এক দেখিতেছে;—
এক বুঝিতে আর এক বুঝিতেছে! ‘শাশ্঵তুরোগঞ্চ ব্যক্তি যেমন সকল
সামগ্ৰীতেই পাণুৰ্বণ দেখিতে পায়, এক্ষত দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া জনসাধারণও
এখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

• • •

এ অবস্থায় মানুষের প্রথমেই বুঝিবার চেষ্টা করা
বেদ কি? উচিত—বেদ কি? আমাদিগের প্রকাশিত খৃঢ় যজুঃ
সাম অথৰ্ব—চারি বেদের মধ্যেই এ তত্ত্ব উদ্ঘাটন-
পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। ‘বেদ’ শব্দে ‘জ্ঞান’ অর্থ সংসৃচিত হয়। যদ্বারা
‘জ্ঞান’ যায়, তাহাই বেদ। বেদ সত্য-মিথ্যার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞানাইয়া দেয়;
বেদ স্বর্গ-নরকের পথ নির্দেশ করিয়া দেয়; বেদ ধৰ্ম জ্ঞানায়; বেদ
অধৰ্ম জ্ঞানায়। ফলতঃ, যাহার স্বারা ধৰ্মাধৰ্মের সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ
হয়, অর্থাৎ যাহার স্বারা স্বরূপ জ্ঞানিতে পারা যায়, এক কথায় যাহার স্বারা
ঐহিক ও পারত্তিক ‘সর্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই বেদ।
সেই সর্ববিধ জ্ঞানেরই নামান্তর—সত্য-বিষয়ক জ্ঞান, পরমেশ্বর-বিষয়ক
জ্ঞান। অতএব, যদ্বারা সত্য-তত্ত্ব অধিগত হয়, পরমেশ্বর-স্বরূপে স্বরূপ-
জ্ঞান জন্মে, পরত্তকে জ্ঞানিতে পারা যায় এবং তাহাতে সম্মিলিত হইবার
আকাঙ্ক্ষা আসে ও তথিষয়ক উপায়-পরম্পরা অবগত হওয়া যায়, তাহাই
বেদ। যেদই গাজ্জায় আজ্ঞাসম্মিলনের একমাত্র উপায়।

• • •

জ্ঞানবেদ—
সন্ধিলনে সহায়।

বেদে যাহা বিশাল বিস্তৃত ভাবে দৃশ্যমান 'স্মহিয়াছে,
'জ্ঞানবেদে' তাহারই আভাস প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে।
মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া যে তৃষ্ণার্ত পথিক নদ-নদীর
সঙ্গানে আকুল হইয়া ছুটিয়াছে ; সে যদি পথিগার্থে তড়াগ-পুকরণীর সলিল-
রাশি প্রাপ্ত হয়, তদ্বারা সে তাহার জীবন-রক্ষার প্রয়াস পাইয়া থাকে।
চির-অশান্তিময় সংসারের মধ্যে পড়িয়া, সেই শান্তির মহাসমুদ্রে চারি বেদের
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যে জন সমর্থ না হইবে, এই 'জ্ঞানবেদে' তাহার
পিংগাসা কিংঠিং নিবারিত হইবার সন্তাবনা। অপিচ, মহাসমুদ্রে বিলনের
পক্ষে নদনদী শ্রোতৃস্থতী যেমন পথ-প্রদর্শক, এই 'জ্ঞানবেদ' ও সেইরূপ
জ্ঞানের অনন্ত-সমুদ্রে মিশিবার পক্ষে সহায় হইতে পারিবে।

* * *

বেদের মধ্যে অনন্তকালের অনন্ত সম্পৎ নিহিত আছে।
জ্ঞানবেদে। বাছিয়া বাছিয়া 'জ্ঞানবেদে' তাহারই কতকগুলি সংগ্রহ
করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মাঝুমের পরিত্রাণ-শান্তির
উপায় বিস্তৃতভাবে বেদে নির্দেশ করা রহিয়াছে। জ্ঞানবেদে তাহারই
কয়েকটী পথ লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বেদে অনন্তকালের অনন্ত সমাজের
অনন্ত ইতিহাস বীজলিপে বিদ্যমান আছে। 'জ্ঞানবেদে' তাহারই কতক-
গুলির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। জগতে যত ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় উদ্ধিত
হইয়াছিল, বিদ্যমান আছে এবং অভ্যুত্থিত হইবে ; বেদে তাহাদিগের
সকলেরই আদি নির্দশন পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞানবেদে তাহারই কিংঠিং পরিচয়
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এমন কিছু নৃতন ছিল না অথবা এমন কিছু নৃতন
নাই এবং এমন কিছু নৃতন হইবে না, বেদে যাহার প্রমাণ নাই। 'জ্ঞান-
বেদে' অঙ্গলি-নির্দেশে তাহাই দেখাইয়া দিবে। সে হিসাবে, এই
'জ্ঞানবেদকে' চতুর্বেদের সংক্ষিপ্তসার বলা যাইতে পারে।

* * *

আমরা নির্দেশ করিয়াছি—বেদ দর্পণ-স্বরূপ। উপর্যায়
অবগত-পর্যবেক্ষণ। বজ্র স্বরূপ-তত্ত্ব সম্যক বোধগম্য করান যায় না।
'চন্দ্ৰ ধালার মত' বলিলে অথবা 'পৃথিবী কমলা
লেবুৰ মত' বলিলে, তাহার একদেশ-বিষয়ে সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা আসে।

তাহারাই মূল বস্তুর সম্যক অভিজ্ঞতা-স্নাত সন্তুষ্পর নহে। সেইরূপ, বেদকে দর্পণ-স্বরূপ বলিলে বেদের প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ হয় না; উহাতে কেবল বেদের এক-দেশের এক-ভাবের গোতনা করা যায় মাত্র। দর্পণের সহিত বেদের তুলনা করার তাৎপর্য এই যে, দর্পণে যেমন মানুষের বিভিন্ন প্রকার আকৃতির বিভিন্ন প্রকার প্রতিবিষ্঵ প্রতিফলিত হয়, বেদের মধ্যেও সেইরূপ বিভিন্ন-মার্গানুসারীর বিভিন্ন রীতি-প্রকৃতি প্রকটিত হইয়া পড়ে। ইহাটি বেদের বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি যে দৃষ্টিতে বেদের প্রতি দৃষ্টি-সংকালন করিবেন; সেই স্তরের সেই সামগ্রীই তিনি বেদের মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ দেখিতে পাইবেন। তজ্জন্মই বিভিন্ন-প্রকৃতির পণ্ডিতগণ বেদের মধ্যে বিভিন্ন বিপরীত ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

বেদ—
অবিতীয়।

‘এ প্রসঙ্গে কেহ হয় তো কুট প্রশ্ন উপাপন করিতে পারেন,—বেদের মধ্যে তবে কি কোনও সত্যবস্ত নাই? অপরিবর্ত্তিত সত্যবস্ত যেখানে আছে, সেখানে এত ভাবান্তর ঘটে কেন? এ পক্ষে উত্তর এই যে,—বস্তু সেই একই আছে, দৃষ্টি-বিভ্রমই যত কিছু ভাবান্তর ঘটাইয়া থাকে। ত্রিশির কাচ-ফলকে বর্ণ-বিবর্ণন দৃষ্ট হয়; কুকলাশের বর্ণ-ব্যাত্যয় অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; কিন্তু মূলতঃ তাহারা সেই একই বস্তু আছে। সেইরূপ বেদের মধ্যে এক পরমার্থ-তত্ত্বই ওতঃপ্রোতঃ বিগ্নমান রহিয়াছে; কিন্তু দৃষ্টি-শক্তির তারতম্যানুসারে তাহাতে নানা বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে। ‘জ্ঞানবেদে’ এ তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। চতুর্বেদের অন্তর্গত যে কোনও একটা গন্তব্যের বিষয় আলোচনা করিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ‘বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা’ প্রসঙ্গে আমরা পুনঃপুনঃ এ বিষয় প্রতিপন্থ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে বুঝা যায়,—কি ভাবের কি মন্ত্র কি ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে! একই মন্ত্র বিধর্মীর দৃষ্টিতে এক অর্থ গোতনা করে; গৃহী তাহাতে অন্য ভাব প্রাপ্ত হয়; সাধক তাহার মধ্যে পরমার্থ-তত্ত্ব লক্ষ্য করেন। ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিকের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের প্রবোধের জন্য, এমন অমানুষিক সামগ্রা জগতের মধ্যে বুঝি আর বিতীয় নাই। বেদ তাই অবিতীয়।

যাহা অবিতীয়, তাহাতে কেন ভিন্ন-ভাব আসে ? খ্রেকের
পুনর্বর্তন। মধ্যে বহুত্বের পরিকল্পনা—ইহাই বা কি প্রকারে
সম্ভবপর হয় ? পরম্পর বিভিন্ন বিপরীত ভাবের
পরিকল্পনাই বা বেদ-সম্বন্ধে কেন দেখিতে পাই ? এ সম্বন্ধে একটা চিন্তার
বিষয় আছে। জগৎ-সৃষ্টির বৈচিত্র্য অমুস্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়,
এ সংসারে নৃতন কিছুই হয় নাই, নাই এবং হইবেও না। যাহা ছিল বা
আছে বা হইবে, তাহাই পুনঃপুনঃ কালচক্রের ঘূর্ণাবর্তে পরিবর্তিত হইতেছে।
এক্ত শ্রেণীর দার্শনিক সম্প্রদায়েরও তাই মত এই যে,— যাহা ছিল, তাহাই
মুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বৃক্ষ ছিল ; লোপ পাইল ; বীজ রহিল ;
আবার বৃক্ষ উৎপন্ন হইল ! পিতা ছিলেন ; স্বর্গস্থ হইলেন ; পুত্র আসিল ;
পিতার স্থান অধিকার করিল ! এইরূপে পর্যায়ক্রমে সংসারে যাওয়া-
আসার লীলা-থেলা চলিয়াছে। সত্য-ত্রেতা-ব্রাহ্মণ কঁলি চারি যুগ এবং
চতুর্বুগের সমষ্টিগত কল্প-কল্পান্তর—তাহারই অঙ্কে সৃষ্টিপ্রবাহ ও কর্মপ্রবাহ
পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইতেছে। অনন্ত-কালের অনন্ত আলেখ্য—বেদে
তাহারই ছায়াপাত আছে। তাই যে জন যে দৃষ্টিতে যে সামগ্ৰীৰ অনুসঙ্গান
করে, বেদের মধ্যে সে জন সেই সামগ্ৰীই দেখিতে পায়।

* * *

জ্ঞানবেদ-
বিভাগ।

জ্ঞানবেদে আমরা সকল দিকের সকল প্রকার দৃষ্টিরই
ইঙ্গিত-আভাস প্রদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

তাই এই ‘জ্ঞানবেদ’ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইল।

আকারে কোনও ভাগ ছোট বা কোনও ভাগ বড় হইলেও বিস্তৃলিখিত
পাঁচটা বিভাগে এই ‘জ্ঞান-বেদকে’ বিভক্ত করিলাম। প্রথম—‘ধৰ্মভাবো-
দীপক পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞাপক’ কতকগুলি মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রাণে প্রাণে
ধৰ্মভাবোদীপনের চেষ্টা পাইয়াছি। এই অংশে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি—
তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হইবে। তত্ত্ববান् কি ভাবে কোথায় বিশ্বাসন
আছেন, এই সকল মন্ত্রের আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে সংক্ষান প্রাপ্ত
হওয়ার সম্ভাবনা। বিতীয়—‘বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা’। কি অনুপম উচ্চ-
ভাবোদীপক মন্ত্র-সকল অপব্যাখ্যার পেষণ-যন্ত্রে পড়িয়া কি অবস্থান্তর
প্রাপ্ত হইয়াছে, এই অংশে তাহা বোধগম্য হইবে। তদ্বারা সত্য-তত্ত্ব অধি-

গত হইতে পারিবে। তৃতীয়—‘আপ্য বেদমন্ত্রসমুহ।’ যে সকল বেদ-মন্ত্র বিধিপূর্বক জপ করিলে আনাবিধ শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অংশে সেই প্রকার কতকগুলি মন্ত্র সম্বিষ্ট হইয়াছে। এই অংশ গৃহী মাত্রেই নিত্য-প্রয়োজনীয় বলা যাইতে পারে। চতুর্থ—‘আধি-ব্যাধি-নাশের উপায়-পরম্পরা।’ অধিকাংশ বেদমন্ত্রই আধিব্যাধি-নাশমূলক। তাহারই কতক-গুলি মন্ত্র এই অংশে সম্বিষ্ট করা হইয়াছে। যাহার শুল্ক আছে, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পঞ্চম—‘প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা।’ প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণায় যাহারা প্রাচীনকালের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রত্ত্বিতি তত্ত্বের অনুসন্ধানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চাহেন; এই অংশে তাহারা তৎপক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন।

* * *

এই জ্ঞানবেদ যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের উপযোগী হয়,
সর্বসাধারণের,
উপযোগী।
তৎপক্ষে আমরা বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়াছি। এই
জ্ঞানবেদ পাঠে যদি কাহারও ইহলোকিক ও পার-
লোকিক মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা হইলেই পরিশ্ৰম সার্থক মনে কৱিব।

শ্রীহৃগ্রান্তি লাহিড়ী (শৰ্ম্মা)।

— • —

‘পৃথিবীৰ ইতিহাস’ কার্য্যালয়, হাওড়া।

৯ই পৌষ, ১৩৭৭ সাল।

বড় দিন।

(২৫। ১২। ৩০)

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—ঁঁ * ঁঁ—

ত্বিক্ষেত্রে পরমং পদং সদা গুণস্তি সুরায়ঃ ।

দিবৌব চক্ষুরাততম্ ॥

* * *

‘হে ভগবন् ! আমায় দেই দিব্যদৃষ্টি দেও, আমি যেন তোমায় অত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই । জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে তোমার পরমপদ অত্যক্ষ করেন । আকাশে দৃষ্টি-প্রতিরোধক বাধার অভাব-বশতঃ চক্ষুশ্বান্ ব্যক্তি যেমন চারিদিক দেখিতে পান ; জ্ঞানিগণ সেইরূপ, সদাকাল সর্বত্ত্ব তোমার যে মহিমা ব্যাপ্ত আছে—তাহা অবিরোধে দেখিতে পান ।’ প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘মুচ্চ অজ্ঞ আমি, হে ভগবন् ! আমার জ্ঞাননেত্র উশ্মীলন করিয়া দেও ;—আমার সম্মুখের বাধা অপসারিত হউক,—আকাশের শ্যায় নির্মল পথে আমি যেন তোমায় সদাকাল সর্বত্ত্ব দেখিতে পাই ।’

* * *

যজ্ঞ-সমূহের, তপস্যাদি কার্য্যের এবং সকল শুভকর্ষের নিম্নৃত রহস্য বেদপাঠে অবগত হওয়া যাব। এই জন্মই বেদ পরম নিঃশ্বেষসু-কর বলিয়া উক্ত হয়। শাঁহারা বেদ অধ্যয়নে বিরত আছেন, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা কাষ্ট-নিশ্চিত হস্তী অথবা চর্মস্থ প্রাণহীন দেহধারী মাত্র। শাস্ত্র-বাক্যের গর্ম এই যে, মানুষ, যদি তুমি সাংসারিক আধিব্যাধিশোকতাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, যদি তোমার পরম-নিঃশ্বেষসু-রূপ মুক্তি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, তুমি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হও। যদি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্তি না জমে, তুমি বুঝাই দেহধারণ করিয়া আছ, বুঝাবে। কাষ্টনিশ্চিত প্রাণহীন হস্তী যেমন অথবা চর্মাচ্ছাদিত প্রাণশূন্য মৃগমৃর্তি যেমন—হস্তীর অথবা ঘৃণের উৎসুক কোনই কার্য্যসাধক নহে; মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া। যদি বেদ অধ্যয়ন না করিলে তোমারও দেহধারণ সেইরূপ বুঝাই হইবে।

• • •

সকল বেদ অধ্যয়ন, সকলের পক্ষে সন্তুষ্পর না হইতে পারে। কিন্তু যিনি যে শাখার অন্তর্ভুক্ত, মে শাখার মে বেদ অধ্যয়ন করা তাঁহার একান্ত কর্তব্য। বিদ্যানুরাগী অনেকেই আছেন; বিদ্যার চর্চা অনেকের মধ্যেই বিগ্নান দেখিতে পাই; গ্রহাদি পাঠে অনেকে অকৃষ্টি-চিন্তে কালঙ্কেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনার ইষ্টসাধক—ঐতিক-পারত্রিকের অঙ্গলপ্রদ যে বেদ, তৎপ্রতি অতি অল্প জনেরই দৃষ্টি নিপত্তি দেখি। ইহা যে আজ্ঞার পরম অনিষ্টকর, তাহা প্রায়ই কেহ স্মরণ করেন না। শাস্ত্র তারস্বরে কহিয়াছেন—“যত্ননধীতবেদৈহস্তত্ত্ব অমং কুর্য্যাং অসৌ সসন্তানঃ শৃদ্রুতমেতি।” অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নে বিরত থাকিয়া যিনি অন্য গ্রহাদি পাঠে সময়ক্ষেপ কুরেন, পুত্রাদি সহ তাঁহার নীচগতি-প্রাপ্তি ঘটে। বেদপাঠের স্ফুল-বিষয়ে শাস্ত্র-বাক্যের অন্ত নহ। সর্প যেমন খোলস পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ লাভ করে, বেদাধ্যয়নের ফলে মানুষও সেইরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে শঙ্ক্রান্তি আছে; যথা,—

“সহস্রকস্ত্রভ্যাস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।

মহতোহপ্যেনমো মাসাং স্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥”

• • •

অনেকের বিশ্বাস, বুঝি বা তোতাপাখীর জ্ঞায় আব্লভি করিষ্যেষ্ট বেদ-পাঠের ফলস্মৰ্ত হয়। তাই অনেকত্র দেখি, মন্ত্রটি মাত্র কঠিন আছে, কিন্তু অর্থজ্ঞান নাই। কেহ কেহ আবার, বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, বেদ-মন্ত্রের অর্থকে বাগ্জালে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহেন। অনুত্ত অর্থ বোধগম্য না হইলে, পরম্পর কদর্থ-বিভ্রমে নিপত্তিত থাকিয়া আভ-শ্রাদ্ধাঙ্গু-খ্যাপনে প্রয়াসী হইলে, শোচনীয় অবস্থাতেই উপনীত হইতে হয়। আমাদের দেশের আঙ্গণ-পণ্ডিতগণের অনেকেই এখন এই অবস্থায় উপনীত। বেদ কি—তাহারা অনেকে হয় ত চক্ষেও দেখেন নাই। অথবা, বেদের কোনও একটা প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখিয়া, তাহাদিগকে লজ্জাবিন্দ্রি হইতে হইত্বাছে; এইজন্য, বেদার্থ প্রচলম রাখিবার আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় বলবত্তী দেখিতে পাই। কিন্তু যাহারা একবাব চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারিবেন,—বেদের মধ্যে কি অমূল্য রত্নরাঙ্গি উজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়া আছে; তাহারা অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারিবেন;—তাহাদের নিকট সত্যের আলোক প্রকাশের জ্ঞায, বেদ-বাকোর অর্থ প্রকাশ-পক্ষে কোনও সংশয় উপাস্থিত হইবে না। বেদাধ্যয়নে অর্থবোধ একান্ত-প্রয়োজন। বেদামুক্তগণিকার প্রারম্ভে মহাগতি সায়ণাচার্য তাই উচ্চ-কর্তৃ বিঘোষিত করিয়াছেন,—‘গিনি বেদ-অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ বেদের অর্থ অবগত নহেন, তিনি স্থাগুণ জ্ঞায কেবলমাত্র ভারবহন করিয়াই থাকেন। অগ্নিহৌন-প্রদেশে শুক-কাষ্ঠ নিঙ্গেপ করিলে, মেষন অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, অর্থ না জানিয। বেদ-মন্ত্র অধ্যয়নও মেইরূপ নিষ্ফল জানিবে।’ এ সম্পর্কে যাক্ষেক্ষণ্যত শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

“স্থাগুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজ্ঞানাতি যোহর্থং।

যোহর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্চুতে নাকমেতি জ্ঞেনবিপ্লুতপাপ্মা॥

যদ্যগ্রহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেন্মেব শব্দ্যতে।

অনগ্রাবিব শুক্রেধো ন তজ্জ্বলতি কহিচিং।”

* * *

মনুষ্য-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, বেদরূপ নেত্রে দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যিনি বেদজ্ঞ নহেন, অঙ্গবস্তু তাহার জ্ঞানাতীত রহিয়াই গেলেন। অস্তি কহিয়াছেন,—“নাবেদবিগ্নমুতে তং বৃহস্ত্রম।” শাস্ত্র-

বাক্য যুদ্ধি মাত্র করিতে হয়, আপনার শ্রেয়োলাভের প্রতি যদি প্রথম
থাকে, সমগ্র বেদ অধ্যয়নে সমর্থ যদি নাও হইতে পার, আপন আপন
শাখার অস্তর্গত বেদ পাঠে অনুরক্ত হও। স্ব-শাখোভ বেদও যদি সমগ্র
পাঠ করিতে সমর্থ না হও, তবে যতদূর সামর্থ্য হয়, তৎপক্ষে বিরত হইও
না। নিত্যকর্ম-বিধিতে প্রতিদিন চতুর্বেদের আদ্যমন্ত্র-চতুষ্টয় অঙ্গাঙ্গরূপে
পঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই পঞ্চন-ক্রিয়া হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি?—
তাহার সার-কর্ম এই যে,—‘চতুর্বেদ পাঠ করিতে উদ্বৃক্ত হও; ‘যদি
সমগ্র বেদপাঠে শক্তি না থাকে, যে বেদের যতটুকু পাঠ করিতে শক্তিমান
হও—তাহাই অধ্যয়ন কর। হেলায় রত্ন হারাইও না।’ বেদ যেমন
কর্মপদ্ধতি-জ্ঞাপক, বেদ তেমনই জ্ঞানের পরিপোষক। একাগ্রচিত্তে
মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন; কর্ম জ্ঞান ভক্তি—ত্রি-তত্ত্বের সাধনায়
অনুপ্রাণিত হইবেন। দেখিবেন,—‘অস্ততমসাচ্ছন্দ হাদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ স্বতঃ-
বিকশিত হইবে। বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবার সময় বেদের প্রথমাংশ প্রথমে
হয় তো কিছু দুর্বোধ জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু উত্তরোত্তর
যতই অশ্রেসর হওয়া যাইবে, ইক্ষুদণ্ডের ক্লেশকর চর্বণ-ব্যাপারের পর
চোষণাপযোগী মধুর ঝর্নের শ্যায় আনন্দসুধাস্বাদ ততই অনুভূত হইবে।

* * *

এই জন্মই সর্বকর্মারভ্যে প্রথমেই শীর্ষোদ্ধৃত আচমন মন্ত্র—“তবিষ্ণেঃ
গৱামং পদং” ইত্যাদি মন্ত্র—উচ্চারিত হয়। উহাতে প্রার্থনা প্রকাশ
পায়,—‘হে ভগবন्! আমার জ্ঞান-পথের বাধা অপসারণ করিয়া দেও—
আমি যেন অবাধে সত্য-দর্শনে সমর্থ হই।’

ভোন-বেদ ।

—————:: * :————

পুনর্মনঃ পুনরায়ৰ্থ আগন্

পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্

পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্বেতঃ ম আগন্ত

* * *

তত্ত্ব প্রার্থনা জানাইতেছেন ;—মন প্রাণ আজ্ঞা চক্ষু শ্বেত আয়ুঃ
প্রভৃতি ফিরিয়া চাহিতেছেন ! কহিতেছেন,—‘হে ভগবন् ! আমার সেই
সকল ফিরিয়া আন্তর এবিধি প্রার্থনায় কি মনে হয় ? মনে হয় না
কি,—‘কি যেন ছিল, এখন যেন হারাইয়াছি, আর সেই হারানিধি পাইবার
জন্য যেন আকুল আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে !’ যদি বলি—‘আমার মন ফিরিয়া
আন্তর’—তাহাতে কি ভাব মনে আসে ? মনে হয় না কি,—সেই যে
সরল অকপট শুন্দসন্তুতাকাষ্ঠিত মন আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া, সে আজ বক্রগতি
প্রাপ্ত হইয়াছে, কল্প-লাঙ্ঘনে লাঙ্ঘিত হইয়াছে ! তাই প্রার্থনা—সেই
মন আমার আন্তর ফিরিয়া আন্তর !

* * *

অনই মূল । ভগবানের সেবাপরায়ণ হইতে হইলে, ভগবৎকার্য্যে জীবন্ত
বিনিযুক্ত করিতে হইলে, শিশুর ন্যায় সরলতা আবশ্যক ;—কুটিল মন
ভগবৎ-সেবার অধিকারী নহে । পঞ্চমবর্ষীয় বালক সেই ক্রবের সরলতায়
সিংহ পর্যন্ত সন্তুত হইয়াছিল । ভগবৎ-প্রাপ্তি-মূলক সারল্য সেইরূপই
হওয়া চাই । ‘হে ভগবন্ত ! আমার মন ফিরিয়া আশ্রুক’—এইরূপ
প্রার্থনায় কি বুঝায় ? বুঝিতে পারি না কি,—‘আমি যেন সরল বিশুদ্ধ
অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি !’

• • •

আর প্রার্থনা হইয়াছে,—‘আমার আয়ুঃ ফিরিয়া আশ্রুক ।’ আমি কি
মরিয়াছি ? কৈ—আমি তো মরি নাই ! ‘জল্জ্যান্ত’ জীবন্ত ! তক্ষে
এবন প্রার্থনা কেন ? আমি যেন এমন আয়ুঃ পাই,—যে আয়ুঃ আমায়
সৎকর্মের পথে লইয়া যাইতে পারে । আহার-মৈথুন-নিদ্রা এই লইয়াই
তো জীবন নহে ! ‘তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে ! তেমন আয়ুঃ
তো অতি নৌচ পাষণ্ডেরও অধিকারে আছে ! এখানে কি ভগবানের নিকট
সেই আয়ুৰ প্রার্থনা হইয়াছে ? কথনই নহে । ‘বুঝিতে হইবে—
সৎকর্মশীল পুণ্যপূত আশ্রুই এখানে কামনার সামগ্ৰী ।

• • *

প্রার্থনায় আরও বলা হইয়াছে,—‘আমার প্রাণ ফিরিয়া আশ্রুক, আমার
আজ্ঞা ফিরিয়া আশ্রুক ।’ আমাদিগের প্রাণ থাকিতেও যে প্রাণ নাই,
আমাদিগের আজ্ঞা থাকিতেও যে আমরা আজ্ঞাশূন্য । কোথায় আমার
প্রাণ ? আমি অনায়াসে অপরের মুখের গ্রাস কাঢ়িয়া লই, আমি ভাই
হইয়া ভাইকে প্রবক্ষনা করি ; আমার আবার প্রাণ আছে ? প্রাণ ছিল
বটে—সেই দিন ;—শিশুকালে যেদিন পুত্রলিকার প্রতি মমতার সংশ্লি
হইত,—ক্ষুদ্র একটা কীটের বিয়োগ-ব্যথায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত ! চৈতন্য ?
—সে তো অনেক দিনই অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ! চৈতন্য থাকিলে
কি আর নিত্য-নূতন অপকর্ম করিয়া, মাথার উপরে যিনি বিষ্ণুমান রহিয়া
সকলই দর্শন করিতেছেন—তাহাকেও লুকাইবাৰ চেষ্টা করিতাম ?
অপকর্ম করি, আর মনকে প্ৰোধ দিই,—‘কেহ দেখিতে পাইল না ।’
এই কি চৈতন্যের কাৰ্য্য ? চৈতন্য ছিল বটে তখন—যখন পাপেৰ পথে

প্রথম অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম! কিন্তু এখন পাপে এতই
অভ্যন্তর যে, পাপ-কার্য্যে এখন আর হৃদয় একবারও কম্পিত হয় না! তাই
প্রার্থনা হইয়াছে,—‘হে ভগবন्! আমার মেই চৈতন্যটুকু ফিরাইয়া দাও!’

• • •

শেষ প্রার্থনা,—‘আমার চক্ষুকে আর কর্ণকে আমি যেন পুনঃপ্রাপ্ত
হই।’ কেন?—আমার কি চক্ষু নাই? এমন ‘ড্যাবডেবে’ জোড়া দুইটা
চক্ষু থাকিতে, আমি আবার চক্ষু ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিতেছি কি!
এইস্তপ, শ্রোত্রও তো কৈ বধির নহে! নিম্না-মুখ্যাতি কৌন্ত কথাই বা
আমি শুনিতে না পাই! তবে আবার শ্রোত্রের প্রার্থনা কেন? চোখও
দেখিতে পায়, কাণেও শুনিতে পাই; তবে আবার কি ফিরিয়া পাইবার
কামনা করি? কেন এ কামনা? কেন এ প্রার্থনা?

• • •

ভাস্ত!—সে এ চোখ—এ কাণ নয়! এ কি আর চোখ—এ কি
আর কাণ? যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-মূর্তি দেখিতে না পাইল,
যে শ্রোত্র ভগবানের গুণকথা শুনিতে না পাইল; পরন্তৰ যে চক্ষু
কেবলই বিষয়-বিলবে আকৃষ্ট রহিল, যে কর্ণকেবলই আত্ম-প্রশংসা ও
পুরঘানি শ্রবণ-রূপ বিষম বিষে পূর্ণ রহিল; সে চক্ষু কি আর চক্ষু?—
সে কর্ণ কি আর কর্ণ-নাম বাচ্য? তাই প্রার্থনা—‘হে ভগবন্। আমায়
মেই চক্ষু দাও—যে চক্ষু কেবল তোমারই রূপ দেখিয়া তম্য হইয়া থাকে!
আমায় মেই কর্ণ দাও—যে কর্ণ কেবল তোমারই কথা-রূপ মুখ-রসে পূর্ণ
থাকে। আমার মনঃ প্রাণ আত্মা ইন্দ্রিয়গণ ভগবদমুসারী হউক।’

জ্ঞান-বেদ ।

তেজোঃসি তেজো মরি ধেহি ।

বৌর্য্যমসি বৌর্য্যং মরি ধেহি ॥

বলমসি বলং মরি ধেহি ।

ওজোহসি ওজো মরি ধেহি ॥

মনুঃসনি মনুং মরি ধেহি ।

সহেহসি সহো মরি ধেহি ॥

আপনি তেজঃ,—আমাতে তেজঃ নিহিত করুন ; আপনি বৌর্য্য,—
আমাতে বৌর্য্য নিহিত রাখুন ; আপনি বল,—আমাতে বল-সংখার করুন ;
আপনি ওজঃ (কাণ্ডি),—আমাতে ওজঃ ধারণ করুন ; আপনি মনু
(ক্রোধ),—আমাতে ক্রোধ রক্ষা করুন ; আপনি সহ (সহিষ্ণুতা),—
আমাতে সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ রাখুন

আমি প্রকৃত মানুষ হইতে চাই,—আমি মানুষের শ্রেষ্ঠ দেবতা হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। তাই আমার কাসনা,—যিনি স্বয়ং তেজঃ, তাহার তেজঃ আমার মধ্যে নিহিত হউক; তাই আমার প্রার্থনা,—যিনি স্বয়ং বীর্য, তাহার বীর্য আমাতে স্বাপিত হউক; তাই আমার আকিঞ্চন,—যিনি স্বয়ং বল, তাহার বল আমাতে সঞ্চিত হউক; তাই আমার প্রয়োগ,—যিনি শুজঃ, তাহার শুজঃ (কাণ্ডি) আমাতে ধারণ করুন। এই সকলই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের —দেবত্বের উপাদান। আমি তাহাই চাই।

• • •

আমি ক্রোধও চাই, আবার সহিষ্ণুতাও চাই; অশ্বির সাহিকা-শক্তি ও যেন আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে;—আবার সলিলের স্নিঘতাও যেন আমার মধ্যে বিরাজ করে। আমি যখন দেখিব—চুর্বিলের গ্রতি প্রবল অথবা পীড়ন করিতেছে,—অত্যাচারীর কশাঘাতে নিরীহ জনের আর্তনাদে গগন বিনীর্ণ হইতেছে; তখন যেন আমার ক্রোধ-বৃত্তি জাগিয়া উঠে,—তখন যেন আমাতে মুক্তিমান তেজঃ বিকাশ পায়,—তখন যেন আমি, প্রবলকে পরাত্ত করিয়া, চুর্বিলকে ঝঞ্চা করিতে সমর্থ হই। এইরূপ, আবার যখন দেখিব, অসুতাপের অশ্রুজলে পাপীর বক্ষঃফল প্লাবিত হইতেছে, অমুশোচনার অস্তর্ক্ষাহে দন্তীভূত হইয়া আততায়ী চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে;—তখন যেন আমার সহিষ্ণুতা তাহাকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দেয়,—তখন যেন আর চুর্বিল দেখিয়া তাহার পীড়নে আমার স্পৃহা না জন্মে। চাই আমি—ক্রোধ-সহিষ্ণুতার এই সাম্য-ভাব। তাই আমি প্রার্থনায় জানাইতেছি,—

“মনুষ্যরসি মনুষ্যং ময়ি ধেহি।

সহোহসি সহো ময়ি ধেহি ॥”

• • •

তাহাই দেবত্ব—তাহাই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব। দেহের মধ্যে—অস্তরের মধ্যে —সকল বৃত্তিরই স্ফূর্তি চাট। অথচ, সকল বৃত্তিরই সংযত ধাকা আবশ্যক। চুর্বিল হইলেও চলিবে না—“নায়মাঙ্গা বলহীনেন লভ্যঃ।” আবার বলের অপর্যবহার করিলেও ধীঢ়িবে না,—“অ প্রযুক্তং বলং মরণং নান্দি সংশয়ং।” যিনি তেজঃ, তাহার নিকট হইতে তাই তেজঃ সংগ্রহ করিতে হইবে; যিনি বীর্য, তাহার নিকট হইতে তাই বীর্যের অধিকারী হইতে হইবে; যাহাতে

বল,—যাহাতে শঙ্কঃ, তাহার নিকট হইতে সেই বল—সেই শঙ্কঃ গ্রহণ-পুরুক আপনাতে ধারণ করিতে হইবে। ইহাই প্রধান শিক্ষা—ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। এখন, কিমে আমরা এই সকলের অধিকারী হইতে পারি,—তাহাই প্রধান চেষ্টা হওয়া আবশ্যিক। ভগবানের বা দেবতার উপাসনা—সে আর অন্য কিছু নয়! ভগবান্ বা দেবতা কি, তাহা বুঝিয়া, তাহার অনুসরণ করাই উপাসনা। সেই উপাসনার প্রভ'বেই দেবতা অধিগত হয়। শীর্ষোন্নত বেদ-মন্ত্র এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে:—

‘দেবতা—বৃত্তন কিছু নহে;

দেবত্ব—সংসার-মাঝে রহে।

মহুষ্যই দেবতা হইতে পারে;—

দেবতার গুণধর্ম অধিকারে।

* * *

এ পক্ষে প্রথমেই বুঝা আবশ্যিক, দেবতাই বা কি—আর দেবত্বট বা কাহাকে কহে! ক তকগুলি বিশিষ্ট গুণধর্মই দেবত্ব, আর তৎসমূদায়ের অধিকারীই দেবতা। যখন বলিব,—দেবতা সত্যস্বরূপ; তখনই বুঝিতে হইবে—যাহা সত্য, তাহাই দেবত্ব,—যিনি সত্যের অধিকারী, তিনিই দেবতা। এইরূপ, যখন বুঝিব—দেবতা দয়াময়, তখনই বুঝিতে হইবে,—যাহা দয়ার কার্য, তাহাই দেবত্ব,—আর, যিনি তাহার অধিকারী, তিনিই দেবতা। এইরূপ,—‘তেজঃ বল’, ‘বীর্য বল’, ‘বল বল’, ‘শঙ্কঃ বল’, ‘অশুয বল’, ‘সহ বল’, যে যে শক্তির যেমন তাবে প্রয়োজন, যাহাতে তাহার যথাযথ সমাবেশ আছে, তিনিই দেবতা। মানুষ! তুমি যদি দেবতা হইবার আকাঙ্ক্ষা কর, দেবত্বের—দেবতার সেই গুণধর্মের-অধিকারী হইবার পক্ষে প্রযত্নপর হও। দেবতার গুণধর্মের বা দেবতাবের অনুসরণ-অনুশীলনই দেবতার উপাসনা। তদ্বাগাই দেবত্ব অধিগত হয়।

ভূন-বেদ ।

আয়ুর্জ্জেন কণ্পতাঃ প্রাণো যজ্ঞেন কণ্পতাম্ ।

চক্ষুর্যজ্ঞেন কণ্পতাঃ শেত্রং যজ্ঞেন কণ্পতাম্ ॥

বাম্ যজ্ঞেন কণ্পতাঃ মনো যজ্ঞেন কণ্পতাম্ ।

আত্ম যজ্ঞেন কণ্পতাঃ ত্রক্ষ যজ্ঞেন কণ্পতাম্ ॥

জ্যোতির্গজ্ঞেন কণ্পতাঃ স্বর্যজ্ঞেন কণ্পতাম্ ।

পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কণ্পতাঃ যজ্ঞো যজ্ঞেন কণ্পতাম্ ॥

• • •

কি প্রকারে আয়ু বৃক্ষি পায়, কি প্রকারে দীর্ঘ শীবন লাভ করিতে পারা
যায়; সমাকাল সকলেরই সেই প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। কেবল মানুষ
বলিয়া নহে,—সংসারের সকল প্রাণীই আয়ুঃ বৃক্ষির জন্য আকুলি-বাকুলি
করিয়া ক্রিয়িতেছে। তবে মনুষ্যের প্রাণিপর্যায় আয়ুঃ বৃক্ষির উদ্দেশ্য

হয় তো বুঝিতে না পারে ; কিন্তু স্মষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী অনুগ্য আ রা,—
আমরাও কি সে উদ্দেশ্য বুঝিব না ? বেং বুঝাইতেছেন,—“আনুর্যেন
কল্পতাম্।” যজ্ঞের জন্য—সৎকর্মের জন্য—সত্যের জন্য—ভগবানের
জন্য—তোমার আয়ুঃ যেন বুঝি প্রাপ্ত হয়।

• .

প্রাপ্তই বা কিমের জন্য ? যে প্রাণ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—
সৎকর্মের জন্য—ভগবানের জন্য নিয়োজিত হইতে না পারিল ; সে প্রাণের
কি প্রয়োজন ? যে প্রাণ পরের জন্য না কান্দিল ; যে প্রাণ আপনার
মুখের গ্রাস অকাতরে অন্তের মুখে ভুলিয়া দিতে না পারিল ; সে প্রাণকে
কি আর প্রাণ বলে ? যে দেশের শাস্ত্র প্রতি জনের নিত্য-কর্মের মধ্য
'পঞ্চসূনঃ' (উন, শিল-নাড়া, বাঁটা, টেক্কির গড়, কলসী-গীড়ি প্রভৃতির
চাপে জীব-নাশ-জনিত পাপ) পাপ নাশের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ;
সে দেশের সে জাতির প্রাণ—কত বড় হওয়া প্রয়োজন, সহজেই বৈধক্ষম্য
হইবে না কি ? বেদ তাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—“প্রাণো যজ্ঞেন
কল্পতাম্।” তোমার প্রাণ যেন, যজ্ঞের জন্য—সৎকর্মের জন্য—সত্যের
জন্য—ভগবানের জন্য, নিয়োজিত হয়।

• .

চক্ষু কি দেখিবে ? তাহার দেখিবার সামগ্রী সংসারে কি আছে ? সে
কি চোরের ঘ্যায় পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া কেড়াইবে ? অথবা, সে
কি নারীর রূপ-স্বৰ্ণ পান করিবার জন্য মত হইয়া পরন্তৰ পশ্চাত পশ্চাত
কিরিবে ? চক্ষুর যদি সে প্রবৃত্তি—সে প্রবৃত্তি হয়, সে চক্ষুকে, বিষমঙ্গলের
মত, উৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারিবে না কি ? অপকর্মের পশ্চাত্কাবন
ভিন্ন, চক্ষুর কাঙ যে অমেক আছে ! সে চক্ষুকে চক্ষুই বলি না,—যে চক্ষু
সত্য-বিদ্যার ঘন্টের মধ্য হইতে সত্যকে বাহিয়া লইতে না পারে ; সে
চক্ষুকে চক্ষুই বলি না,—যে চক্ষু এই বিদ্যাকে সংসারে আসিয়া সত্যের অনু-
সরণ করিতে সমর্থ না হয় ! পরত্ত, সেই চক্ষুই সার্থক চক্ষু,—রূপ দেখিতে
হেথিতে যে চক্ষু শর্বকালে শর্বভূতে সেই জগৎপিতার রূপ দেখিয়া তাহার
হইতে পারে ! বেদ সেই শিকাই দিতেছেন—“চক্ষুর্হজেন কল্পতাম্।”
তোমার চক্ষুকে যজ্ঞের জন্য—সৎকর্মের জন্য—সত্যের জন্য বিনিযুক্ত কর !

কেন-না, তাহাতেই সর্বভূতে আঘাতশৰ্ণ হইবে,—সকল কল্পেই ক্লপময়ের অপরূপ ক্লপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। যে চক্ৰ ভগবা-কে না দেখিতে পাইল, সে চক্ৰ চকুই মহে। পরম্পৰা, বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বমাথ গে মনোময় মোহন ক্লপে বিৱাজমান রহিয়াছেন, যে চক্ৰ তাহা প্রত্যক্ষ কৰিল;—প্রত্যক্ষ কৰিয়া, আনন্দে বিভোর হইতে পারিল; সেই চকুই চক্ৰ।

• • •

ঞ্জিক্লপ শ্রোতৃ ! শ্রোতৃ (কণ) ! তুমি পুরুৎসা-শ্রবণে বড়ই আনন্দ পাও—নহ ? যেখানেই পুরচক্ষা, সেখানেই তুমি উৎকর্ণ হইয়া আছ ! আর, মিথ্যা-শ্রবণেই কি তোমার তৃপ্তি ? জগতে যত কিছু মিথ্যা আছে, সহস্রধারায় তোমার রঞ্জে প্রবেশ কৰিতেছে; আর তাহাতেই তুমি আনন্দ পাইতেছ। বলি, এই জন্যই কি তোমার স্থষ্টি ? যদি তাই হয়, এখনই সীমক গলাইয়া কণ-রঞ্জে ঢালিয়া দেওয়া হউক; কণরঞ্জ বন্ধ হউক। জগৎপাবন ভগবানের মহিমা-কীর্তন, যে কর্ণে প্রকেশ কৰিল না; সে কর্ণতো কর্ণ ই মহে ! তাই বেদ বলিতেছেন—“শ্রোতৃঃ যজ্ঞেন কল্পতাম্।” যজ্ঞের জন্য—সৎকর্মের জন্য—তোক জন্য—আজ্ঞা বিনিযুক্ত হউক। চক্ৰ দেখুক—জগৎজোড়া তাঁৰ ক্লপ; আর কণ-শূন্যক—জগৎযাপী তাঁৰ মহিমা—প্রতি পতঙ্গীৰ স্বরে প্রতি বাতানিলোলে, সর্বদা সর্বত্র কৌর্তিত হইতেছে। তবেই তো শ্রোতৃৰ সার্থক সমাবেশ।

• • •

বাক ! কেন মিথ্যা বলিতে তোমায় এত ব্যগ্র দেখি ? আবশ্যকে অনাবশ্যকে এ সংসারে প্রায় সকল মানুষই কেন মিথ্যা বলিতে চাঙ ! কেবল মিথ্যা বলা মহে; পরম্পৰা জৈবের যাহাতে অনিষ্ট ঘটে, প্রতি মানুষকেই আবার তত্ত্বপ ঘৰ্য্য-কথায়েও অভ্যন্ত দেখি। মিথ্যা বলিবে, লেকের অহিতকৰ কথা কহিবে,—বা'গন্ধীয় !—এই জন্যই কি তোমার স্থষ্টি ! যদি তাই হয়, কোনও প্রয়োজন নাই,—তেমন জিজ্ঞা এখনই কাটিয়া ফেলা হউক। বেদ উপদেশ দিতেছেন,—“বাগ, যজ্ঞেন কল্পতাম্।” তোমার বাক্য, যজ্ঞের জন্য—সৎকর্মের জন্য—সত্যের জন্য—ভগবানের উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হউক। যদি কথা কহিতে হয়, কও—সত্য কথা ! যদি কথা কহিতে চাও, কথা কও—যজ্ঞের জন্য—সৎকর্মের জন্য।

যদি বাক্যস্ফুর্তির আবশ্যক হয়, হটক—ভগব'নের পতিতং বন আজ্ঞা-পরিকীর্তন ! সহ্য তিনি আর কথা নাই, ভগবনের মহিমা-কৌর্তন তিনি আর বাক্য নাই। যে বাগিচ্ছিয় তাহাই জানিল,—সেইই বাগিচ্ছিয়, অন্যথায়, বাগিচ্ছিয় বাগিচ্ছিই নহে।

* * *

আজ্ঞা বল, মন বল, ব্রহ্মা (বেদ) বল, জ্যোতিঃ (স্বংশ্লিষ্ট-পরমাজ্ঞা) বল, স্বঃ (স্বর্গ) বল, পৃষ্ঠ (স্তোত্র) বল—কিছুই কিছু নহে ; —সকলই যদি সৎকর্মসাধনে সত্ত্বের উদ্দেশ্যে বিহিত না হয়। ফলতঃ মূল লক্ষ্য সকলেবই হওয়া চাই—য সন্ধান, সৎকর্মকরণ, সত্ত্বের অনুসরণ। যে অঙ্গ বা যে বৃত্তি সৎকর্মসাধনে সত্ত্বের অনুসরণে সমর্থ না হইল, তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন প্রয়োজন। অপিচ, যে আজ্ঞা, যে মন, যে বেদ, যে জ্যোতিঃ বা যে স্বর্গ—সত্ত্বের পথ প্রদর্শনে সমর্থ না হইল, সে আজ্ঞা—আজ্ঞাটি নহে, সে মন মনই নহে। সে আজ্ঞা চাই না, সে ব্রহ্মা চাই না, সে জ্যোতিঃ চাই না, সে স্বর্গ চাই না, সে স্তোত্রেও প্রযোজন নাই। আজ্ঞা যদি সত্ত্বে অন্ত হইতে না পারিল, মন যদি সত্ত্বের অনুসরণে ধাৰণা না রহিল, ব্রহ্মা (বেদ) যদি সত্ত্বের সকান না জানাইল, জ্যোতিঃ বা স্বর্গ যদি সত্ত্বের দৰ্শন না করাইল,—তবে সে সকলে কি প্রযোজন ? . বেদ তাই সকল উপদেশের চরম উপদেশ দিতেছেন,—‘যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম।’ তোমার যজ্ঞও মেন আ'বার যজ্ঞেঁ কল্প বিহিত হয়। আমরা যজ্ঞ করি, সৎকর্মে প্রবৃত্ত হই, সত্ত্বের সকান লই,—সকলই এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া। কত কামনা থাকে কত—প্রার্থনা থাকে—অনুরাগে। আমরা অনেক সময় সৎকর্মের অনুগ্রান করি, উচ্চপদ লাভ ক'বার কল্প, অথবা স্মার্ম-স্মৃতিঃ আর্জনের আশায়। চাই ধন, চাই মশঃ, চাই শক্রবাণ, চাই মনোরূপ পঞ্জী ; যজ্ঞ করি, আর প্রার্থনা জানাই,—“ধৰং দেহি ক্লপং দেহি যশো দেহি দ্বিযো তহি” ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। যজ্ঞ কর, সৎকর্ম কর, সত্ত্বের অনুসারী হও ; কিন্তু অন্য আকাজ্ঞা প্রাণে মেন হান না পাব। তাই বেদ বলিতেছেন—“যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম।”

জ্ঞান-বেদ।

শুঃ চ মে ভয়শ্চ মে প্রিমঃ চ মেহুকামশ্চ মে
— — — , —

কামশ্চ মে সৌমনশ্চ মে
— —

ত্তগশ্চ মে জ্বিণঃ চ মে রুদ্রঃ চ মে শ্রেষ্ঠ মে
— — — . —

বসৌরশ্চ মে যশ্চ মে—যজনে কণ্পতাম।
— —

• • •

যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্মের জন্য—আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হউক। আমার ঐহিক স্থথ, আমার পাবলোকিক স্থথ, আমার সকল প্রকার স্থথ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্মের জন্য—পরিকল্পিত হউক। আমার শ্রীতিপদ সামগ্রী, আমার অমূকলমাধ্য পদার্থ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্মের জন্য—নিয়োগিত হউক। আমার বিষয়-ভোগজন্য কামনা, আমার চিত্তস্থপদ স্থলদৃগণ, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্মের জন্য—বিনিযুক্ত হউক। আমার সৌভাগ্য, আমার কল্যাণ ও পারলোকিক মঙ্গল, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্মের জন্য—নিষিদ্ধিত হউক। আমার বাসস্থান, আমার যশঃকীর্তি, যজ্ঞের জন্য—সত্যের জন্য—সৎকর্মের জন্য—অমুস্ত হউক। ফল তঃ, আমার ‘আমার’ বলিতে যাহা কিছু আছে, সকলই যজ্ঞের জন্য—সৎকর্মের জন্য—তগবাণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হউক! এই সকলই মানুষের প্রান সকল হউক।

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ ॥ ঃঃ—

গাঁথি তা গায়ত্রিণোহৃষ্টস্ত্রকর্মকীণঃ ।

ত্রিক্ষাণস্ত্রা শতক্রত উদ্বিশমিব ষেমিরে ॥
— — —
• • •

কিবা স্মরানে, কিবা খাত্রোচ্চারণে, কিবা অন্য কোনরূপ তোত্রে,
যেখানে যে নামে যে ভাবে ভগবানের অর্চনা করা হউক না কেন, সে
সকল অর্চনাই সর্ব-স্বরূপ সেই একেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়।
বুঝা উচিত—সকল পূজাই তাহার পূজা।

• • •

কেহ ইন্দ্রদেবতার পূজা করেন, কেহ বায়ুদেবতার পূজা করেন, কেহ
অগ্নিদেবতার পূজা করেন, কেহ বা শি঵ের, কেহ বা ব্রহ্মার, কেহ বা
বিষ্ণুর অর্চনায় ত্রিতীয় আছেন; আর, কেহ বা দুর্গার, কেহ বা কালীর,
কেহ বা জগদ্বাতীর, কেহ বা সরস্বতীর উপাসনা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের
অনেকের হস্তে হ্য তো দেৱ-ভাবও বিষমান থাকিতে পারে। কিন্তু
প্রথম অবস্থায় তাহাতেও কোনও জড়ি নাই। কেন-না, ভগবান् সর্ব-
দেবতা। যিনি যে দেবতারই পূজা-অর্চনা করন, সকল পূজা-অর্চনাই
তাহাতে গিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ, এ মন্ত্রে আমরা এই উপদেশ
পাইতেছি যে, যে পথ দিয়াই হউক, অগ্রসর হও;—অগ্রসর হইতে
হইতেই তাহার সরিধানে উপনীত হইবে।

— • • •

অধুনা নৃতন নৃতন যুক্তির অবতারণায় নৃতন নৃতন পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল যুক্তি যে সর্বথা শ্রেষ্ঠঃ, তাহা কখনই মনে করিতে পারিনা। একটা দৃষ্টান্তের অবতারণায় বিষয়টা বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অনেকে, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের যুক্তিজ্ঞাল বিস্তার করিয়া, আমাদের প্রতিমা-পূজা প্রভৃতিকে নিষ্ফল হেয় প্রতিপন্থ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সে তাহাদের বিষম ভাস্ত। কেন-না, ঐ প্রতিমা-পূজার মধ্যে দিয়াই প্রতিমার যিনি লক্ষ্যস্থল, তাহার নিকট পৌছান যায়।

* * *

সমুদ্র যে কি, কখনও দেখি নাই; অথবা সমুদ্র যে কি, তাহা জানি না; কিন্তু যদি আমি জানি, এই নদীতেই সমুদ্রের রূপকণা আছে, আর এই নদীশ্রোতের অঙ্গমন করিলেই সমুদ্রে উপনীত হওয়া যায়; তাহাতে, তদনুরূপ কর্মের ফলে, সমুদ্র-দর্শন বা সমুদ্রে গিলন আমার পক্ষে সন্তুষ্পর হইয়া আসে না কি? এই জন্যই বলিতে হয়,—যাঁহার যে পথ নির্দিষ্ট আছে, তিনি সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করুন;—অগ্রসর হইতে হইতেই কেন্দ্রস্থানে উপনীত হইতে পারিবেন। এই জন্যই আরও বলি, “স্বধর্ম্মে মিধনং শ্রেষ্ঠঃ” গীতার অমূল্য বাণী জনে জনে স্মরণ করুন। একেবারে পর্বত-নজন-আশা দুরাশা মাত্র। অগ্রসর হউন—ধীরে ধারে অগ্রসর হউন। অগ্রসর হইলেই অভীট সামগ্রা পাইবেন।

* * *

এ মন্ত্র বুঝাইয়া দিতেছেন,—‘সংশয়ান্বিত হইও না; যেরূপে যে প্রণালীতে হউক, ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও; তোমার সকল অচ্ছন্নাই তাঁধার নিকট পৌছিবে। ফলতঃ, যে মার্গানুসারীই হও, তুমি সর্বতোভাবে ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা কর।’

জ্ঞান-বেদ ।

—ঁ * ঁ:—

উদীক্ষা^১ জীবো^১ অমুন^১ আগামপ

প্রাগান্তম আজ্ঞ্যোত্তিরেতি ।

আরৈক^১ পত্তাঃ^১ যাতবে^১ সুর্যায়াগম্ব

যত্র^১ প্রতিরুত্ত^১ আয়ুঃ^১ ॥

• • •

“উষার আলোকে সংসার যেমন জাগ্রৎ হয়, প্রকৃতির মনোহারিটী মৃত্তি
যেমন দেখিতে পায়, আপন আপন দৈনন্দিন কর্মে যেমন প্রবৃত্ত হইতে
পারে; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরাও মেইন্স হৃদয়ের মধ্যে উষার
আলোক লক্ষ্য কর;—ঞ্চ দেখ, জ্ঞানোন্মেষিণী উষা তোমাদিগকে জাগ্রৎ
করিবার জন্য নবীন আলোকরশ্মি বিছুরণ করিতেছেন;—ঞ্চ দেখ, তিনি
তোমাদিগকে নির্দিশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন,—‘জীবাঙ্গা চৈতন্য লাভ
করিয়াছেন, অজ্ঞান-অঙ্ককার অপসৃত হইয়াছে, পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ
পাইয়াছে, জ্ঞান-সূর্যের প্রকাশ পথ উন্মুক্ত উদ্বাটিত হইয়াছে।’ আরও,
ঞ্চ দেখ, তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন,—‘উঠ, এস, নিতান্ত

গন্তব্য সেই পথে সেই দেশে গমন কর,—সমাধিলক্ষ যে পথে যে দেশে যাইতে পারিলে জীবন-ধারণ-রূপ আয়ুকাল বদ্ধিত হইবে,—আর ক্ষীণ হইতে হইবে না ; মুক্তি পাইবে, অমরত্ব লাভ করিবে।'

* * *

কিন্তু সে কোনু পথ ? সে কোনু দেশ ? বৃথা বিভীষিকায় ভয় পাইও না—হতাশ হইও না। দূরে নয়—চুপ্পাপ্য নয় ; কল্পনাৰ বহির্ভূত বা দৃষ্টিৰ অতীত স্থানও নহে। ঐ দেখ,—সে দেশ তোমার সম্মুখেই বিশ্বান্ত ! ঐ দেখ,—সে দেশে উপনীত হইবাৰ সৱল সুগম পথ দেবতাই তোমাকে দেখাইয়া দিতেছেন ! উষার আলোকে উৰুৰু হও ; জ্ঞানোশ্চেষণী দেবতাৰ অনুসরণ কৰ ; দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে, জ্ঞানিতে পারিবে,—সে পথ সে দেশ কত দূরে ! . ঐ দেখ, দিব্য জীবন্ত সে দেশেৰ সে পথেৰ চিত্র জ্ঞানদেবতা তোমার ঘোক্ষেৰ উপৱ কেমন প্ৰতিভাত কৱিয়া রাখিয়াছেন ! ঐ. দেখ, দেবতাই তোমাকে নির্দেশ কৱিয়া দেখাইয়া দিতেছেন,—

“যশ্চায়মশ্চিমাকাশে তেজোময়োহযুতময়ঃ পুরুষঃ সর্বামুভুঃ।

যশ্চায়মশ্চিমাজ্ঞনি তেজোময়োহযুতময়ঃ পুরুষঃ সর্বামুভুঃ।

তথেব বিদিষ্ঠাতিযুক্ত্যমৈতি নান্যঃ পশ্চাঃ বিশ্বতেহয়নায়।”

দূরে নয়—এই নিকটেই—আকাশে অর্থাৎ সর্বত্র যিনি বিশ্বান্ত ; অধিক বলিব কি, তোমার বিজ্ঞেৱ মধ্যেও যিনি নিত্য ক্রিয়মাণ ; অপিচ, যিনি সকলই জ্ঞানিতেছেন—ঝাহার অজ্ঞিত কিছুই নাই ; সেই তেজোময় জ্ঞানযয় পুরুষকে অবগত হওয়াই—ঝাহার শরণাগতি লাভ কৱাই—মুক্তিৰ ঘোক্ষেৰ বা অমৃত-লাভেৰ প্ৰকৃষ্ট পথ ; তঙ্গিৰ মুক্তিৰ ঘোক্ষেৰ বা অমৃত-লাভেৰ পথ আৱ বিতীয় নাই।

* * *

শুনিলাম—বুঝিলাম—দেখিলাম ; কিন্তু পথে অগ্ৰসৱ হই কি প্ৰকাৰে ? জ্ঞানিতেছি—বুঝিতেছি—দেখিতেছি—যিনি সংবয়, সৰ্বস্বৰূপ, সৰ্বভূতাজ্ঞা, ঝাহাকে জ্ঞানিলেই—ঝাহাকে লাভ কৱিলেই—যুক্ত্যজ্ঞী অমৃত হওয়া যাব। কিন্তু সে জ্ঞানাৰ—সে লাভ কৱাৰ উপায় কি ?—পক্ষতি কি ?—অবলম্বন কি ? সংসাৰে যত কিছু বিতঙ্গা, সেই বিষয় লইয়াই।

ইহ-জগতে যে কিছু ধর্ম-সম্প্রদাধের অভ্যর্থনা ঘটিয়াছে, সকল সেই পথে
অগ্রসর হইবার কল্পনাতেই। যাহার চিত্ত-দর্শণে যে ভাব প্রতিবিষ্ঠিত
হইয়াছে, তিনি সেই ভাবেই অন্যকে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন! ঈ
যে যোগমুগ্ধ যোগী বল্মীকস্তুপে পরিণত হইতেছেন; ঈ যে সংসারত্যাগী
সম্ম্যাসী অনশনে দেহত্যাগ করিতেছেন; ঈ যে পরমেবাত্মতধারী, জীব-
শিবে সমজ্ঞানে, জীবসেবায় জীবনপাত করিতে বসিয়াছেন; আরঁ ঈ যে
আজ্ঞানী ‘মোহহঁ’ চিত্তায় পরিমগ্ন রহিয়াছেন; এ সকলই সেই
উপদেশের—সেই অমুভাবনারই ফল। ফলতঃ, যিনি যে কর্মে প্রবৃত্ত
রহিয়াছেন, সকল কর্মেরই লক্ষ্য অভিম। নানা দিকে নানা ভাবে মনুষ
সেই সঙ্গানেই ধাবমান হইয়াছেন,—কি প্রকারে মৃহৃজ্জয়ী হওয়া যায়!

. . .

এই উন্মাদনাই সংসারকে অসংখ্য কর্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে। সে কর্ম-
সমূহের মধ্যে কোন্ কর্ম নিকৃষ্ট বা কোন্ কর্ম প্রকৃষ্ট, তাহা নির্দেশ করিতে
যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। নদ-নদী সরল কুটিল বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন পথে
প্রধাবিত হয়। তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য—সাগর-সম্মিলন। হইতে পারে,
তাহাদিগের মধ্যে কচিৎ কেহ তুষ্ণির শরুভূমির মধ্যে পড়িয়া প্রাণহারা
হয়; অথবা, কাহাকেও বা অপরের মধ্যে আত্মলীন করিতে হয়। কিন্তু
সে বিতর্কের মধ্যে অগ্রসর না হইয়া, স্ফুলভাবে আমরা কোন্ পথ লক্ষ্য
করিতে পারি, তাহাই বিবেচনাধীন। সে পথ আর কিছুই নহে; সেই
পথই শৃঙ্খলি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—তোমায় দেখাইয়া দিতেছেন,—

“যশ্চায়মশ্চিমাকাশে তোজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।”

জ্ঞান-বেদ ।

তমো মিত্রো বরুণো মামহস্তামদ্বিতিঃ

মিঞ্চুঃ পৃথিবী উত ষ্ঠোঃ ॥

অতঃপর মিত্র, বরুণ, অদিতি, মিঞ্চু, পৃথিবী এবং
চুয়-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

এক স্থানে—একটী মন্ত্র নহে ; বেদে বিভিন্ন মন্ত্রে ঝৰ্বা-স্বরূপ
বিশেষিত রহিয়াছে ;—বিভিন্ন কর্ষে প্রার্থনার পর প্রার্থনায় প্রকাশ
পাইয়াছে—“তমো মিত্রো বরুণো মামহস্তামদ্বিতিঃ মিঞ্চুঃ পৃথিবী ষ্ঠোঃ ।”
হে মিত্রদেব ! হে বরুণদেব ! হে অদিতিদেব ! হে মিঞ্চুদেব ! হে
পৃথিবীদেব ! হে চুয়দেব ! অতঃপর আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

কিন্তু কে—সে দেবগণ ? কোথায় তাহাদিগের অবস্থিতি ? কি করণেই বা তাহারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন ? মিত্র, বরুণ বা অদিতি-সমূহকে ধর্মান্তর উপস্থিত হইতে পারে । কেই বা মিত্র, কেই বা বরুণ, কেই বা অদিতি—এতবিষয়ে বিতর্কও দেখিতে পাই । কিন্তু পৃথিবী, সিঙ্গু ও ছ্যলোক (আকাশ) সমূহকে সর্বত্রই ঐকমত্য দেখি না কি ? আমাদিগের আবাস-ভূমি এই পৃথিবী—নিত্যকাল আমরা দর্শন করিতেছি ; আবার এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া, নিম্নে জলরূপী সমুদ্র এবং উক্তে শুক্ররূপী আকাশ যে বিশ্বান রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছি । সুতরাং এই তিনের সমূহকে কোনই মর্তবৈধের কারণ নাই ।

• • •

কিন্তু প্রার্থনা জ্ঞানান হইয়াছে,—তাহারা আমাদিগকে রক্ষা করন । জিজ্ঞাসা করি,—তাহারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন কি করিয়া ? যে দৃষ্টিতে সচরাচর পৃথিবী প্রভৃতিকে দেখিয়া থাকি, তাহাতে পৃথিবীর বা সমুদ্রের বা আকাশের কি শক্তি আছে যে, তাহারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন ? ভূমি সারাজীবন ধরিয়া পৃথিবীর—এই জলমৃত্তিকাময়া ধরিত্বীর—নিকট প্রার্থনা কর ; তিনি কিছুতেই তোমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না । এইরূপ, ছ্য বা আকাশ, সিঙ্গু বা সমুদ্র, অথবা মিত্রই বল, আর বরুণই বল, আর অদিতিই বল, ডাকিয়া ডাকিয়া অশ্বিকঙ্কালসার করিলেও, কেহই তোমায় সাড়া দিবেন না,—কেহই তোমায় রক্ষা করিবেন না বা রক্ষা করিতে পারিবেন না ।

• • •

তবে কি ঐ সকল দেবতার সম্মোধন বৃথা ? তবে কি বেদ-মন্ত্র নির্বর্ধক ? তবে কি ধীহার যে শক্তি নাই, তাহাতে সেই শক্তির আরোপ করিয়া বেদ আমাদিগকে বিভাস্ত করিতেছেন ? অবিশ্বাসী, নাস্তিকের মনে সহস্র তাহাই ধারণা হয় বটে ! কিন্তু একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে, আস্তি একেবারে অপনোদিত হয় । কি প্রকারে ? তাহারই আভাস দিতেছি । তাহাদিগের (ঐ দেবতাগণের) অভূতের বিষয় একটু বিস্মৃত হও দেখি ! তাহাদিগের অভূতের বিষয় জুলিয়া গিয়া, দেবতার বিষয় অনুধাবনা করিয়া, যদি তাহাদিগের উপাসনা করিতে পার, পরম উপাসনা-

শব্দের অস্তুর্ত মিগৃঢ় অর্থের ধারণা-পূর্বক তাঁহাদিগের নিকটে যদি একটু অগ্রসর হইতে পার, তবেই রক্ষা প্রাপ্ত হইবে। এ পক্ষে বুঝিবার প্রয়োজন,—দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব; বুঝিবার আবশ্যক,—ঐ এক এক দেবতার মধ্যে কি গুণ বা কি শক্তি আছে! আর প্রয়োজন,—তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা বা তাঁহাদিগের উপাসনায় মেই গুণের বা শক্তির কতটুকু অধিকারী হওয়া যায়। মেই গুণের বা মেই শক্তির সমীপে হওয়া—অধিকারিতা-লাভই তাঁহাদিগের উপাসনা। কিন্তু কেবল পৃথিবী প্রভৃতির নাম ধরিয়া জাকা—উপাসনা নহে।

* * *

দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিবার চেষ্টা পাইতেছি। মনে করুন—ঐ পৃথিবী! বিচার করিয়া দেখুন—কি গুণ বা কি শক্তির জন্য পৃথিবী-নামের সার্থকতা! মেই বুঝিয়া তাঁহার অনুসরণ করুন দেখি! অনুসরণ বলিতে, মেই গুণের বা মেই শক্তির অধিকারিতা-লাভ। পৃথিবী—ধর্মী—সর্বৎসহা—সকলেরই আশ্রয়দাত্রী। তুমি পৃথিবীর উপাসনা করিতে চাও? তাঁহার বহু গুণ শক্তির মধ্যে এই একটার প্রতি প্রথম লক্ষ্য নির্দেশ কর দেখি! তাঁহার উপাসনা বলিতে তাঁহার গুণের ও শক্তির অধিকারী হইতে হইবে। সংসারে যদি তুমি পৃথিবীর জ্যায় সহ-গুণের অধিকারী হইতে পার, শক্তি-মিত্রে ভেদ-জ্ঞান না করিয়া যদি তুমি সংসারের সকলকে আপনার করিয়া লইয়া আপনার জ্ঞানে আশ্রয় দিতে সমর্থ হও; তাহা হইলেই তোমার পৃথিবী-দেবতার উপাসনা করা সার্থক হইল! তাহাই উপাসনা। পৃথিবী-দেবতা যে তোমায় রক্ষা করিবেন, তোমার মেইরূপ উপাসনা দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়,—অন্যথায় নহে।

* * *

প্রত্যেক দেবতার স্বরূপ ও তাঁহাদিগের উপাসনা-সম্বন্ধে এই ভাব অহণ করা কর্তব্য। প্রথমে বুঝা আবশ্যক,—মেই সকল দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব কি? তাহা বুঝিয়া, তাঁহাদিগের গুণে গুণবন্ত এবং তাঁহাদিগের শক্তিতে শক্তিমন্ত হওয়াই তাঁহাদিগের উপাসনা! দেবতার উপাসনার ইহাই তাৎপর্য। গুণের ও শক্তির বিকাশ ধেয়ন অসংখ্য অগণ্য প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে, দেবতাও মেইরূপ অসংখ্য-অগণ্য মুর্তিতে সংসারে

ବିଚାରଣ କରିତେଛେନ । ଯାହାକେ ଭଗବାନ୍ ବା ପରମେଶ୍ଵର ବଲିଯା ଅଭିହିତ କରି, ତିନି ସେଇ ସକଳେଇ ସମ୍ପତ୍ତିଭୂତ । ତିନି ସର୍ବସ୍ଵରୂପ; ସକଳ ଦେବତାଇ ତୀହାର ଅଞ୍ଜଳୁଁଙ୍କାର । ଏ ସଂମାରେ ଯାହା କିଛୁ ଦେଖିତେ ପାଇ, ଯାହା କିଛୁ ବିଷମାନ ଆଛେ, ସେ ସକଳଇ ତୋ ତିନି, ଅଥବା ତୀହାର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ-ସରୂପ ! ପୃଥିବୀ ବଳ, ସମୁଦ୍ର ବଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ର-ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ବଳ, ସକଳଇ ତୀହାର ରୂପ । ସଂମାରେ ଯତ କିଛୁ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ଆଛେ, ସକଳଇ ତୀହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ସକଳ ବିଭୂତିରେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଉପହିତ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ହେଲା, ତାହାର ପଥ ଅଶ୍ଵେଷଣ କର । ସେଇ ପଥ—ଦେବତାଗଣେର ସରୂପ-ତତ୍ତ୍ଵ ଅନୁଧାବନ, ଏବଂ ତୃତ୍ୱ ଅନୁଧାବନେ ତଦମୁସରଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲା ।

* * *

ମନେ କରନ,—ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତୀହାର ରଶ୍ମିମୁହ । ମନେ କରନ,—ସମୁଦ୍ର ଓ ତୃତ୍ୱମ୍ବିଲିତ ନନ୍ଦ-ନନ୍ଦୀ-ସମୁହ । ରଶ୍ମିମୁହ ଯେମନ ତାହାଦିଗେର କେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଉପହିତ ହେଲା ଏହିତେ ନିର୍ଗତ ହଇଯା ପୃଥିବୀକେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରେ; ଭଗବାନେର ଗୁଣ ବା ବିଭୂତି-ସମୁହ ସେଇରୂପ ସର୍ବତ୍ର ଦେବତା-ରୂପେ ବିସ୍ତୃତ ହଇଯା ଆଛେ । ରଶ୍ମିର ଅନୁମରଣେ ଯେମନ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୌଛାନ ଯାଏ; ଦେବଗଣେର ଅନୁମରଣେ—ଚରାଚରବ୍ୟାପ୍ତ ମଦ୍ଦଗଣାବଲିର ଅନୁମରଣେ, ସେଇରୂପ ଭଗବାନେ ଉପହିତ ହଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ । ସମୁଦ୍ର ହିତେ ଉଥିତ ବାଞ୍ଚିରାଶି ଯେମନ ନନ୍ଦ-ନନ୍ଦୀର ଜନମିତା, ଆବାର ନନ୍ଦ-ନନ୍ଦୀର ସଲିଲ-ରାଶି ଯେମନ ସମୁଦ୍ରେ ମିଶିବାର ଜୟଇ ହୁରିତ-ଗତି, ଭଗବନ୍ତପାଦପଦ୍ମ ହିତେ ବିନିଃସ୍ତ ମାନୁଷେରେ ଓ ସେଇରୂପ ଗତି-ମତି-ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ।

* * *

ଫଳତଃ, ମିତ୍ର-ବର୍ଣ୍ଣାଦି ଯେ ସକଳ ଦେବତାର ବିଷୟ ମନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଥ୍ୟାତ ଦେଖିତେଛି, ତୀହାଦିଗେର ଗୁଣ-ଶକ୍ତିର ଅନୁମରଣେଇ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଏ—ଇହାଇ ତାତ୍ପର୍ୟ । ଦେବତାର ଉପାସନା—ଦେବତା-ଲାଭେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।

জ্ঞান-বেদ ।

উজ্জিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্ত্রেমহে ।

উপ শ্র যন্ত্র মুক্তঃ সুদানবঃ ইন্দ্র প্রাশুর্ভবা সচ ॥

দেবতা নিজিত আছেন। দেবতাব হৃষিভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।
আমরা দেবসম্বন্ধ হইতে ধিচ্ছত হইয়া পড়িয়াছি। এ চিন্তা একবারও
হৃষে জাগিতে চাহে না। এ অবস্থার প্রতি আমাদের আর্দ্ধ দৃষ্টি পড়ে
না। সংসারের নানা যোহ-জালে আমরা নিয়ত বিজড়িত থাকি। অশন
শব্দম শয়ম তোজন—এই সব লইয়াই আমরা নিয়ত বিত্রিত আছি।
শৈশ্বর-দারিজ্য অভাব-অনটম—তাহারাই আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে।
তাহাদেরই সেবার জন্ম, অভাব-অনটনের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার
জন্ম, অপকর্মের উপর অপকর্ম করিয়া যাইতেছি,—আর সেই চিন্তাতেই
লিঙ্কের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে। দেবতা নিজিত কি জাগ্রৎ—
মেধিবার আর অবসর পাইলাম কৈ !

যদি এই চিন্তাও কথনও হৃদয়ে উদয় হয়, যদি এইরূপ ভাষ্মার রশ্মি-
রেখা কথনও হৃদয়ে বিকাশ পায়; দেবতাকে ডাকিবার জন্য মানুষ তখনই
ব্যাকুল হইয়া পড়ে,— তখনই সেই লোকপালক দেবতাকে সম্মুখে করিয়া
মানুষ বলিতে পারে,—“উচ্চিষ্ঠ অঙ্গণস্পতে দেবযন্ত্রেমহে।” লোকপালক
সেই অঙ্গণস্পতি-দেবতাকে জাগ্রৎ করিবার জন্য আহ্বান করিতে করিতে,
ক্রমশঃ সকল দেবতাই হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন,—শক্র বিমর্দক দেবতা
আসিয়া তখন শক্রকে সকল বিপদকে দূরীভূত করেন। অতএব, আমা-
দিগের প্রথম-আবশ্যক,— দেবতা কি ভাবে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন,
তৎপ্রতি লক্ষ্য করা। সেই দিকে লক্ষ্য করিতে করিতেই দেবতার নির্দিত
অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে; আর, তখনই স্থপ্ত দেবতাকে জাগ্রৎ করিবার
স্পৃহা আসিবে। দেবতা জাগ্রৎ হইলেই সকল বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইবে।

* * *

এই মন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। আমার সমস্তে দেবতা নির্দিত
আছেন—দুরে অবস্থিতি করিতেছেন—এই ভাষ্টাও একবার হৃদয়ে উদয়
হউক! তাহাতেও শুফল আছে। যখন সাধকের মনে এই ভাব জাগরিত
হয়, তিনি অমনি ডাকেন,—“উচ্চিষ্ঠ অঙ্গণস্পতে দেবযন্ত্রেমহে।” সঙ্গে
সঙ্গে অমনি তাঁহার অন্তরে প্রতিখনি উঠে,—‘উপ প্র যন্ত মরুতঃ
স্বদানবঃ’! পরমদানশীল মরুদেবগণকে তখন নিকটে আনিবার আকাঙ্ক্ষা
হয়। সাধক তখন প্রার্থনা করেন,—‘হে শোভনদাতা দেবগণ! আপনারা
আসিয়া আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হউন।’ দেবতার আগমন-পথে যে সকল
অন্তরায় আছে, যে সকল শক্র নানারূপ অন্ত ধারণ করিয়া সে পথ আট-
কাইয়া রহিয়াছে, তখন সেই পথের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। তখন
শক্রনাশক দেবতার শরণাপন হওয়ার আবশ্যক হয়। সাধক তখন আবার
ডাকেন,—‘ইন্দ্র প্রাণুর্ভবা সচ।’ অর্থাৎ—‘হে দেবরাজ! আপনি
আসিয়া শক্রদিগকে নাশ করুন,—দেবগণের আগমন-পথের বাধা দূরীভূত
হউক।’ ফলতঃ, হৃদয়ে একটা দেবতাব একবার জাগাইবার
চেষ্টা কর। তাহাতে সকল দেবতাই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন।
বেদ-মন্ত্র এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

— — • — —

জ্ঞান-বৈদ |

—•••—

প্ৰিয়ং মা হৃণু দেখেয় প্ৰিয়ং রাজসু মা হৃণু।

প্ৰিয়ং সৰ্বিস্য পশ্যত উত শূড় উতার্যো ॥

• • •

‘উচ্চকে অবনমিত কৱিতে হইবে, মানীৰ মান টুটাইয়া দিতে হইবে’,—
পৃথিবীব্যাপী এই একটা আন্দোলন চলিয়াছে। তঙ্গন্ত কোথাও আৱ
শাস্তি নাই। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে—
আমেরিগিৱিৰ আভ্যন্তৱীণ জালায়ালাৰ ন্যায় বিদ্বেষেৰ ভাৰ-প্ৰবাহ অধুনা
সৰ্বত্র ক্ৰিয়াশীল দেখিতেছি। ভাৱতবৰ্ষে এই ভাবেৰ অভিব্যক্তিনা
দেখিতে পাই—প্ৰধানতঃ আঙ্গণ-বিদ্বেষে।

• • •

‘আঙ্গণগণ ঘোৱ স্বার্থাস্বেষী ছিলেন ! তাহাদিগেৱ রচিত শাস্ত্ৰ-গ্রন্থসমূহ
—কেবল তাহাদিগেৱই স্বত্ত্ব-সম্পত্তি প্ৰতিষ্ঠাৱ পক্ষে বিধিবিধান প্ৰবৰ্তন

করিয়া গিয়াছে !’ এই একটা ভগ্ন-ধারণা আজকাল অনেকের মনে ক্রিয়া করিতেছে ! আঙ্গণের প্রায় সকল জাতিই—এমন কি অনেক আঙ্গণ-সন্তান পর্যন্ত—এই ভগ্ন-ধারণার বশবর্তী হইয়া কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । আঙ্গণগণকে অবনম্নিত করাই তাহাদের লক্ষ্য এখন । ফলে, দেশ-মধ্যে একটা নৃতন অশাস্ত্রির সৃষ্টি হইয়াছে,—নৃতন একটা রেষারেষী দ্বেষাদৃষ্টি দলাদলি প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দেখিতে পাইতেছি ।

* * *

যাউক সে কথা । যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলিবার চেষ্টা পাইতেছি । আঙ্গণগণের উপর যে শিখ্যা দোষারোপ করিয়া সমাজ-শরীর ছিম-বিছিম করা হইতেছে, প্রসঙ্গতঃ তৎসম্পর্কে ছাই এক কথার আলোচনা করিতেছি । বেদ—সকল শাস্ত্রের শিরোমণি । তাহার উপর আর কোনও শাস্ত্রবাক্য তিষ্ঠিতে পারে না । শৰ্বোক্ত বেদমন্ত্রে আঙ্গণগণ কি প্রার্থনা জানাইতেছেন, একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন দেখি ! দেবগণকে আহ্বান করিয়া তাহারা বলিতেছেন,—‘আঙ্গণগণের প্রিয়কার্য্যের জন্য আমরা প্রার্থনা করি না । হে দেবগণ ! সকল স্মাজের সকলেরই যাহাতে সমভাবে প্রিয় সাধিত হয়, আপনারা তাহাই করুন । কি আঙ্গণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি আর্য্য, কি অনার্য্য—সকলেরই যেন সমভাবে হিতসাধন হয় ।’

* * *

যাহারা সর্বলোকের হিতকামনায় এইরূপ প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হন ; পরস্ত পৰ্ব্বি সম্পদ-বিভক্তে তৃণাহপি তুষ্ণ জ্ঞান করিয়া যাহারা যুষ্টি-ভিক্ষায় জীবন যাপন শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করেন ; সেই আঙ্গণের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবের উম্মেষণ করা—ইহার ঘট্যে কি নিগুল কোনও কারণ রিষ্টান্ত নাই ! যেখানে সত্যের আদর, যেখানে ত্যাগের আদর্শ, মেঘানেই প্রাপ্তানের পরাকার্ষা । আঙ্গণ যখন আঙ্গণ ছিলেন ; তাহাদিগের যায়লিঙ্গার আঙ্গ-ত্যাগের পরহিতসাধনত্বতের সত্যপরায়ণত্বার বিজ্ঞ-পত্রকা-মূলে তখনে ভাবতের সকল সম্প্রদায়ই সর্বতোভাবে সমবেত হইত । স্বতরাং বিদেশী বিদ্যুর্মুখী কাহারও কুখনও সাধ্য ছিল না যে, আঙ্গণের প্রত্যাবর্তন উদ্দেশ্যে করিয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠান্বিত হয় ! বর্ণিত-বিশ্বাসিত্বাত্মক সম-সাময়িক

বিবরণ স্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইলেও, ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে না কি,—এই সেদিনও—কলির পূর্ণ প্রভাবের মধ্যেও—দরিদ্র আঙ্গণ চাণক্যের অঙ্গুলি-হেলনে চন্দ্রগুণের সাম্রাজ্য কিরণে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ! ত্যাগের আদর্শ আঙ্গণ দেশের মন্তক হইয়া দাঢ়াইয়াছিলেন ; স্বতরাং আঙ্গণের প্রভাব দিগন্তবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আঙ্গণ—কক্ষচূড় ; স্বতরাং জাতীয়-জীবন বিচ্ছিন্ন বিস্তুর ।

* * *

জাগো আঙ্গণ !—আবার জাগো ! আবার সেই বেদমন্ত্রে প্রার্থনা জানাও,—“প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শুন্দ উত্তার্যে ।” তোমাকে যে যতই অবহেলা করুক, তুমি কিন্তু তোমার কর্তব্য কদাচ ভুলিও না। তুমি কিন্তু নিয়ত প্রার্থনা কর,—“জগতের সকলের মঙ্গল হউক ।” আঙ্গণ-শুন্দ ভেদ-জ্ঞান তোমাতে যেন স্থান না পায়। তাহাই তোমার জাগরণ। তোমার সেই জাগরণেই দেশ আবার জাগিবে,—তোমার সেই জাগরণই দেশে পুনঃ শান্তি আনয়ন করিবে। তোমার সেই জাগরণই তোমার আঙ্গণত্ব । ত্রি দেখ, বেদ-মন্ত্র তোমায় সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছেন ; আরণ করাইতেছেন,—

জাগো—জাগো হে আঙ্গণ ।

তুমি না জাগিলে, জাগিবে না অন্য জন ।

কোথা সে দেবতা—কোথা সে মহু—কোথা সে ত্যাগের আদর্শ মহান् ।

দেবতার হিতে, দধীচি হইয়ে, যে আদর্শে করেছিলে অস্থিদান ॥

দেখাও বীরস্ত—দেখাও বিক্রম—যে বীর্য-বিক্রমে নিঃক্ষত্রিয় হইল ধরা ।

পরশুরামের কুঠার আবার ধরহ করেতে—চক্রিত হৈক অগরা ॥

সংযোজন ব্যাপিঙ্গা দেব-মানবের সমন্ব-আরাব উঠিছে ভীষণ ।

শুনিলা না শোন, নৌরূ বা কেব, দেব-হিতে প্রাণ কর সম্পর্ণ ॥

ত্যাগের আদর্শ দেখাও আবার—দেখাও তোমার বীরস্ত-বিক্রম যত ।

তোমার আদর্শে জাগিবে এ জাতি—পদাঙ্গ-গমনে কভু হবে না বিরত ॥

জাগো—জাগো হে আঙ্গণ !

তুমি না জাগিলে জাগিবে না অন্য জন ॥

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃঃ—

নমো জ্যোষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ

নমং পুর্বজায় চাপরজায় চ ।

নমো মধ্যমায় চাপগলুভায় চ

নমো জ্বত্যায় চ বুধায় চ ॥

* * *

জ্যোষ্ঠাই হউন, আর কনিষ্ঠাই হউন, পুর্বজাই হউন, আর মধ্যমাই হউন,
অপরজাই হউন, আর অপগলুভাই হউন, জ্বত্যাই হউন, আর বুধাই হউন,—
সকল দেবতাই সকলের পৃষ্ঠা ও নমস্ত । দেবতায় ইতর-বিশেষ নাই ।
দেবতাব বা সন্তার্ব যেখানেই পরিদৃষ্ট হইবে;—তা মানুষেই হউক,
আর পশুতেই হউক, ঘৰেই হউক, আর জঙ্গমেই হউক, জড়েই হউক,
আর চেতনেই হউক, প্রাণিতেই হউক, আর উদ্ধিদেহেই হউক ; যেখান
হইতেই দেবতাবের বিকাশ পাইবে ;-- যাহার নিকট হইতেই দেবতাব-
সংঘয়ের সন্তাননা দেখিবে ; তাহাকেই তোমার নমস্ত বলিয়া মনে
করিবে,—তাহারই নিকট হইতে মেই ভাবের অনুপ্রাণনায় উদ্বৃক্ষ হইবে ।

* * *

ক্ষুদ্র আমি ; সহসা বৃহৎকে আয়ত্ত করিতে পারিব কেমন করিয়া ?
পক্ষ আমি ; একেবারেই গিরি-লঙ্ঘনের আশা—আমার পক্ষে দুরাশা
নহে কি ? আমি যেমনটা, আমার অবলম্বন বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাই
তেমনটাই হওয়া প্রয়োজন ! আমার বুঝিয়া দেখা উচিত—আমি যেমন
ক্ষুদ্র, তেমনই আমার উপর্যোগী বস্তুর সাহায্যেই আমাকে বৃহত্তে পৌঁছিতে
হইবে ! ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়াই যে বৃহত্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রকৃতির
রাজ্যে এ দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। ক্ষীণাঙ্গী তটিনীর মধ্য দিয়াই অনন্ত
মহাসমুদ্রে অগ্রসর হইতে পারি ; ক্ষুদ্র অগ্নিশূলিঙ্গেই দিগ্নাহী অনলের
স্থষ্টি হইতে পারে। ফলতঃ, সৎসন্ধি-মিল্লির সহায়তা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা
যেখানেই আছে, ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক, তাহারই অনুসরণে শ্রেয়ঃ
অধিগত হইতে পারে। স্বতরাং ক্ষুদ্র বৃহৎ কেহই উপেক্ষণীয় নহে ;—
যেখানে যে সম্ভাব আছে, তাহাই পরিগ্ৰহণীয়। ক্ষুদ্র বলিয়া ক্ষুদ্রকে
অবহেলা করিতে নাই। পরন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু সম্ভব আছে, তাহাই
গ্ৰহণ কৰাৰ আবশ্যক দেখি। বেদ-মন্ত্রে তাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ জ্যোত্ত-কনিষ্ঠ
সকলকেই সমভাবে নমস্কাৰ আনন হইয়াছে।

* * *

এ নমস্কাৱেৰ লক্ষ্য—ক্ষুদ্রত্বে বা বৃহত্বে নহে ; পরন্তু বুঝিতে হইবে,—
ক্ষুদ্রত্বেৰ ও বৃহত্বেৰ মধ্যে যে মহাত্মুক্ত আছে, এ নমস্কাৰ তাহারই উদ্দেশ্যে।
আমাদিগেৰ মধ্যে নিত্য-সংঘটিত চিৱ-আচাৰিত একটা দৃষ্টান্তে বিষয়টা
বুঝিবাৰ চেষ্টা পাইতেছি। মানুষ মানুষকে গুৱান্তে বৱণ কৱেন,—দেবতা-
আনে তাহার পুজা-অৰ্চনা কৱেন। অধিক কি, “অথগুলাকাৰঃ”
ইত্যাদি মন্ত্রেও গুৱা-প্রণাম বিহিত আছে। দেখিলে মনে হয়,—যেন পৱ-
অঙ্গোৱ অৰ্চনা কৱা হইতেছে। গুৱাগাতায় গুৱার যে সকল লক্ষণ ও
নাম আছে, তাহাতে গুৱা ও পৱমেৰ অভিন্ন বলিয়াই মনে হইবে।
কিন্তু ইহাতে কি বলিবেন ? বলিবেন কি—গুৱাই অঙ্গ বা পৱমেৰ
হইয়াছেন ? কথনই নহে। এখানে বুঝিতে হইবে—এ সকলেৰ মূল
লক্ষ্য কি ! অনুধাৰণ কৱিয়া দেখিতে হইবে—এতদ্বাৰা আমৱা কি
অশংসয়িত মিলান্তে উপনীত হইতে পারি !

* * *

এ সকল ক্ষেত্রে একটীকে অবলম্বন করিয়া অপরটীকে পাইবার প্রয়াস
বা আঁকাঙ্গা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। মানুষকে ‘অথশ
মণ্ডলাকার’ বলায় মানুষ কথনই অথশমণ্ডলাকার হয় না; অথবা,
কাহাকেও বিমুক্ত বা শিব বলিলেই তিনি তাহা হয়েন না। বিবেচনা করিয়া
দেখুন—তবে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? চিঞ্জকে কেন্দ্ৰীভূত কৱাই—ঝোন-
কার লক্ষ্য। যাহার প্রতি শ্ৰী অন্নে, যাহাকে আদৰ্শ বলিয়া মনে হয়,
আমাৰ নিজেৰ অপেক্ষা তাহাতে তগবধিভূতি অধিকমাত্ৰায় ক্ৰিয়াশীল আছে
—ইহা মনে কৱা স্বাভাৱিক। জ্ঞানীৰ নিকটই জ্ঞানলাভ হয়, দীপ হইতেই
দীপ প্ৰজ্বালিত হইয়া থাকে, জলাশয় হইতেই জল প্ৰাপ্ত হওয়া যায়। অতঃব
আমাৰ নিকট ধিনি জ্ঞানী, আমাৰ পক্ষে ধিনি দীপস্বরূপ, আমাৰ সমক্ষে
ধিনি প্ৰশান্ত সৱোৰ, আমাৰ অজ্ঞানতাৰ ঔধাৰ দূৰ কৱিবাৰ জন্য, আমাৰ
অঙ্ককাৰৰ গন্তব্য পথে আলোকবৰ্ত্তিকা ধৰিবাৰ জন্য, আমাৰ পিপাসার্ত
শুককঠো কিঞ্চিৎ স্মিন্দিবাৰি প্ৰদানেৰ মিমিত, আমি তাহারই ছাৱে উপস্থিত
হইয়া থাকি। তাৰ পৱ, ক্ৰমে তাহার দ্বাৱাই, তাহার মিকট সন্দাম পাইয়াই,
আমি অনন্ত-জ্ঞানেৰ অনন্ত আলোকেৰ অনন্ত মহাসমুদ্রেৰ নিকট পৌছি-
বাৰ আশা রাখি। এই দৃষ্টিতেই, যে অবলম্বনেৰ দ্বাৱা মূল-ক্ষেত্ৰে
উপনীত হওয়া যায়, তাহাতেও মূল-ক্ষেত্ৰত আৱোপ কৱা হইয়া থাকে।
নচেৎ, এ আৱ অন্য কিছুই নহে; এ কেবল—পঙ্কু অবলম্বন-ব্যষ্টি
মাত্ৰ। যষ্টি নিজে যে তোমায় বহন কৱিয়া নইয়া যায়, তাহা নহে;
তাহাকে অবলম্বন-স্বরূপ গ্ৰহণ কৱিয়া তুমি নিজে অগ্ৰসৰ হইতে থাক।
অপৱেৰ সাহায্যে একটু আজ্ঞাশক্তিসংকাৰ—সক্ষ্য এই মাত্ৰ,—তা সে
কুড়ই হউক, আৱ বৃহৎই হউক। কুড়-বৃহৎ বা ক্ষেত্ৰ কনিষ্ঠ—এই
যে সকলেৰ মমকাৰ, ইহাৰও লক্ষ্য আৱ কিছুই নহে। লক্ষ্য—ধৈৰ্যানে
যে কিছু সহস্ত আছে; সকলেই আমিয়া আমাতে মিলিত হউক,—বিন্দু
বিন্দু অঘৃতেৰ সংকাৰে আমাকে অমৃতময় কৱিয়া ফুলুক। সে সহস্ত কুড়েৰ
ঘধ্যেও আছে, আৰাৰ অহতেৰ ঘধ্যেও আছে, তাই কুড়-বৃহৎ সকলকেই
আমাৰ মমকাৰ কৱি। সকলেৱই অন্তৰ্ভুত সহস্ত আমাদিগকে আশী
হউক,—ইহাই ঐ নমকাৰেৰ বা তদন্তগত প্ৰাথমিক আকাঙ্ক্ষা।

জ্ঞান-বেদ ।

মিত্রঁ হৈবে পুত্রকঁ বৰুণঁ চ রিশাদসঁ ।

ধিরঁ স্বত্রাচীঁ সাধনা ॥

ভক্ত সাধক এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে মিত্রদেব ! হে বৰুণদেব ! আপনাদের অমুধ্যানে—আপনাদের অমুশ্঵রণে, আমাদের মনে যেন ঐকাণ্ডিকী ভক্তির সংক্ষার হয় ; আর, সেই ঐকাণ্ডিকী ভক্তির প্রভাবে, জ্ঞানাগ্নির স্ফুরণে, আমরা যেন তাহাতে অন্তরের শক্তিসমূহকে—কাম-ক্লোধাদি রিপু-সমূহকে—আছতি-প্রদানে সমর্থ হই ।’

জ্ঞান—ভক্তির অমুসারী । ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না । আবার জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই অভিন্ন,—উভয়েরই ভিত্তি কর্ণ । ভক্তিতত্ত্ব নিরতি-শয় ছুরধিগম্য । সেই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পীরিলে, পর্যায়ক্রমে ঝাহার সাযুজ্য-লাভ পর্যাপ্ত অধিগত হয় । শ্রীভগবান् গীতায় বলিয়াছেন,—

“ভজ্যা মাত্রভিজানাতি যাবান যশচাপ্তি তত্ততঃ ।

ততো মাং তত্ততো জ্ঞানা বিশতে তদনন্তরয় ॥”

‘ভক্তির ধারাই ভক্ত আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে । আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয় ।’

• • •

ତୁମি ଆରା ବଲିଯାଛେନ,—‘ଯଦି ଦୁଃଖନିବୃତ୍ତି ଓ ହୃଦୟଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିତେ ଚାହୁଁ, ମୁଦ୍ଗତଚିହ୍ନ ହୁଁ । ଆମାର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପରାଯଣ ହିତେ ଅଭ୍ୟାସ କର ; ଆମାର ଉପାସନାୟ ପ୍ରସ୍ତର ହୁଁ ; ଆମାକେ ନମଶ୍କାର କର ; ଏବେଷ୍ଟକାରେ ଆମାର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହଇଯା ଆମାର ଅନୁମରଣ କରିଲେ, ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହିବେ ! ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହିଲେ, ତୋମାର ସକଳ ସଂକଳନ ଦୂରେ ଯାଇବେ ; ତୁମି ପରମାନନ୍ଦ-ଲାଭେ ସମର୍ଥ ହିବେ । ଆମାର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ୍, ଆମାର ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆମାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିତେ କରିତେ, ପରମ ସଂତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେନ ଏବଂ ପରିଶେଷେ ଆସାଇଛି ଲୀନ ହନ ।’

“ମଧୁନା ଭବ ମନ୍ତ୍ରକୋମଦ୍ୟାଙ୍ଗୀ ମାଂ ନମସ୍କୁର ।
ମାମେବୈଷ୍ୟସି ବୁଝେବମାଆନଂ ମୃପରାଯଣଃ ॥
ମଞ୍ଚିତା ମୃଦ୍ଗତପ୍ରାଣା ବୋଧ୍ୟସ୍ତଃପରମ୍ପରମ୍ ।
କଥୟସ୍ତଃ ମାଂ ନିତ୍ୟଃ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମଣ୍ତି ଚ ॥”

* * *

ଭଗବନ୍-ପ୍ରମଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା, ଭକ୍ତି-ମହକାରେ ତୁମାର ଭଜନା କରା,—
ଭକ୍ତିର ସ୍ଵରୂପ ଉପଲକ୍ଷିର ଇହାଇ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ଶାଙ୍କ ତାଇ ପୁନଃପୁନଃ ମେଇ
ମଞ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନେର ପ୍ରତି ଗନ ସମ୍ମୟନ୍ତ କରିବାର ଉପଦେଶ ଦିଯାଛେ ।
ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ ଦଲିଯାଛେ,—‘ଆମି ସବ୍ୟାପୀ ମଞ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ । ଆମାର ମେଇ
ସ୍ଵରୂପ ତତ୍ତ୍ଵ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତିର ଦ୍ୱାରାଇ ଅବଗତ ହେଉଥା ଯାଏ । ଆମାର ସ୍ଵରୂପ-
ତତ୍ତ୍ଵ ଅବଗତ ହିଲେ, ସାଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆମାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିତେ ପାରେନ ।
ଆମାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଲେ, ସାଧକ ଓ ଆମି ଅଭିନ୍ନ ହିଁ । ସାଧକ ଆମାର
ସ୍ଵାରୂପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ।’ ଫଳତଃ, ଭଗବାନେର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିମାନ୍ ହିତେ ପାରିଲେଇ
ସକଳ ଦୁଃଖେର ଅବସାନ ହୁଁ । ଭଗବାନେର ସ୍ଵରୂପ ବୁଝିବାର ହିଲେ, ତୁମାର ପ୍ରତି
ଭକ୍ତିମାନ୍ ହେଉଥା ‘ପ୍ରୟୋଜନ । ଭକ୍ତିର ସ୍ଵରୂପ, ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତିର
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ଲିମ୍ୟ ହୁଁଯନ୍ତମ ହିଲେ, ତାର ତାହା ହୃଦୟନ୍ତମ କରିଯା ତଦ୍ଦନୁମାରେ
ତୁମାର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିମାନ ହିତେ ପାରିଲେ, ଚିରମୁଖଲାଭ ବା ମୁକ୍ତି ଆପନିଇ
ଅଧିଗତ ହୁଁ । ଭକ୍ତ କି—ପ୍ରଥମେ ତାହାଇ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟୋଜନ । ଭକ୍ତିର
ନାମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ—ନାମ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଁ । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନେର ପ୍ରତି ଐକାନ୍ତିକୀ
ଆନୁରଙ୍ଗିଷ୍ଠ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିପଦବାଚ୍ୟ । ଶାନ୍ତ୍ରେ ଭକ୍ତିର ବିବିଧ ଲକ୍ଷ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ମେ ସକଳ ଲକ୍ଷ୍ଣଗେରଇ ମାର ତତ୍ତ୍ଵ—ଐକାନ୍ତିକତାର ମହିତ,

একপ্রাণতার সংহিত, ভগবানের প্রতি আনুরক্ষ। “ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু”
গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ নিম্নরূপে পরিবর্ণিত রহিয়াছে; যথা,—

“অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মান্বৃত্যাবৃত্যং।

আনুকূল্যেন কৃষণানুশীলনং ভক্তিরূপমা॥”

• • •

শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের প্রীতির কর্ম কঠিতে হইবে। মে কর্ম ‘অন্যাভিলাষিতাশূন্য’ অর্থাৎ অন্য সর্বপ্রকার অভিলাষ বা কামনা বর্জিত হওয়া চাই। আর হওয়া চাই—‘জ্ঞানকর্মান্বৃত্যাবৃত্যং’ অর্থাৎ তাহা যেন জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়। ভগবানের প্রতি মে একান্তিকী ভক্তি, তাহা জ্ঞানের অধীন নয়, কর্মের অধীন নয়। অর্থাৎ,—‘জ্ঞান-কর্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবান् শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকের মে কর্মানুষ্ঠান, তাহাই উত্তম ভক্তি।’ সাঙ্গিল্য-সূত্রে আছে,—‘সাপরানুরক্ষীশ্঵রে।’ ভগবানে অনুরাগই ভক্তি। ভগবানের প্রতি ‘অনুরাগ আর কি হইতে পারে? ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্মের অনুষ্ঠানই তাহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের নির্দশন। তাই ভগবান্ তারস্তরে ঘোষণা করিয়াছেন—

“মৎকর্মকুন্তৎপরমো মন্ত্রজ্ঞঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ ম মাগেতি পাণ্ডবঃ॥”

• • •

‘যিনি আমার প্রিয়কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।’
কিন্তু তাহার (ভগবানের) আবার প্রিয়কর্ম কি ? পশ্চিতগণ বলেন—
তাহার প্রিয়কর্ম—তাহার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে
যে অন্যতা ভক্তি জন্মে, ভগবৎ-প্রাপ্তির তাহাই একমুক্তি উপায়। ভক্ত
সাধক সৎকর্মস্থারাই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তদ্বারাই তিনি সর্বপ্রকারে
অসৎ-সঙ্গবর্জিত, সর্বভূতে সমদর্শী ও নিত্যগুরু হইতে পারেন।

— — —

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃঃ—

অতঃ পরিজ্মলাগভি দিবো বা রোচনাদধি ।

সমশ্চিন্তাভ্রতে গিরঃ ॥

আমরা মুখে বলি—তিনি সর্বব্যাপী । অথচ, আমাদের চিত্ত নিত্য সংশয়াশ্বিত—তিনি এখানে আছেন, কি সেখানে আছেন, দ্যুলোকে আছেন—কি আদিত্য-মণ্ডলে আছেন ! এই সংশয়ই মাঝুমের প্রকৃতি । মন্ত্র মাঝুমের মনের এই প্রতিষ্ঠিতি সূর্য-সূর্য-ভাবে একটিত রহিয়াছে ।

তাকিতেছি—‘হে সর্বব্যাপিন !’ অথচ, প্রার্থনার সময় কহিতেছি—‘তুমি দ্যুলোকে, কি অস্তরিক্ষ-লোকে, অথবা দীপ্তিমান् সূর্যলোকে, যেখানেই থাক, এই যজ্ঞে আগমন কর ।’ তবেই বুকা যায়—দৃঢ়বিশ্বাস এখনও জয়ে নাই, সংশয়-সাগরে পড়িয়া চিত্ত-তরী এখনও হাবুভু থাইতেছে । অজ্ঞান-অমার প্রগাঢ় অঙ্ককালে খণ্ডে-মধ্যে এক একবার জ্ঞানের বিদ্যুৎ বিজ্ঞুরিত হইতেছে বটে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মেঘাস্তরালে বিলীন হইয়া যাইতেছে ।

‘আমরা সর্বত্তোভাবে আপনার মহিমা কীর্তনে লিঙ্গ হইয়াছি ; আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন ।’ এ উক্তি—সাধারণ মানুষের সাধারণ ধারণার অন্তর্ভুক্ত ! মানুষ মনে করে যে,—‘আমরা তাহার মহিমা কীর্তন করিতেছি বা স্তব করিতেছি ; তাহা হইলেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন !’ হায় ভ্রান্ত ! তাহার আবার মহিমা কীর্তন করিবে কি ? যিনি সকল মহিমার আশ্রয়ভূত, যাহা হইতে সকল গুণ সূকল বিশেষণ উৎসর্গিত, তাহাকে আবার কি বলিয়া মহিমাস্থিত করিবে ? যিনি সকলের বড়—যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ—তাহাকে বড়’ বলিলে বা শ্রেষ্ঠ বলিলে তাহার মহিমা বাড়ান হয় কি ? সত্ত্বাটকে সত্ত্বাট, বলিলে, তাহাতে তাহার মহিমা বাড়ে না, অথবা তাহাতে তাহার কিছু আসে-যায় না । .বিশেষতঃ তগবানের সামৌপ্য সারূপ্য সাযুজ্য লাভ প্রভৃতি মানুষের যাহা লক্ষ্য, কেবল গুণ-বিশেষণের উচ্চারণে অথবা কেবল মহিমা-কীর্তনে সে লক্ষ্য কখনও পিছ হয় না । কীর্তনে, স্মরণে, অনুধ্যানে—তত্ত্বাবে ভাবাদ্বিত হইবার প্রয়োজন আসে । .সেই প্রয়োজনের ফলে, সৎকর্মাদির সাধনে, মিছি করতলগত হয় । ইহাই সাধন-ফল-প্রাপ্তির ক্রম-পর্যায় !

* * *

এ মন্ত্রে সাধারণ-দৃষ্টিতে সাধারণ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইলেও, ইহার নিখৃত লক্ষ্য—স্তুতির সম্যক্ প্রসাধন (গিরঃ সম্ম ঝঞ্জতে) । প্রসাধন শব্দের অর্থ—সম্পাদন । স্তুতির সম্যক্ প্রসাধন বা সম্পাদন—ইহার তাৎপর্য কি ? তত্ত্বাবে ভাবাদ্বিত হওয়া বা তৎকর্মে কর্মাদ্বিত হওয়া । বলিতেছি—ভূমি সৎ । আকাশ—সাযুজ্য-লাভ । কিন্তু কেবল মুখে ‘সৎ সৎ’ বাক্য উচ্চারণ করিলেই কি সাযুজ্য-লাভ হইতে পারে ? কখনই না । ‘সৎ সৎ’ বলিতে বলিতে, স্মৃতির সাধনায় সৎ হইতে হইবে । তবে তো সাযুজ্য-লাভ সম্ভব হইবে ! তুমি শ্যামপর, আমি তোমার স্বাক্ষর্য পাইতে চাই ; তৎসঙ্গসাধনে আমাকেও শ্যামপর হইতে হইবে । ইহাই স্বাক্ষর্য-লাভের লক্ষ্য । এইরূপ, তাহাতে যে যে গুণের আরোপ করি, সেই সেই গুণের অধিকারী হওয়াই স্বাক্ষর্য-লাভ । ‘স্তুতি-সম্যক্ প্রকারে সম্পাদন করি’ প্রভৃতি বাক্যের অধ্যে—সৎকর্ম-সম্পা-দনের ভাব আসিতেছে । কেবল মুখে উত্তিগান করিয়া নিরস্ত হইলে হইবে

না ;—কার্য্যে তাঁহার সাফল্য দেখাইতে হইবে, যাহারা সে সাফল্য দেখাইতে পারেন, তাঁহাদেরই বলিষার অধিকার আছে—‘হে সর্বব্যাপিন् ! আপনি যেখানেই থাকুন, আমার এই মণ্ডে আগমন করুন’

* * *

স্তব-স্তুতির লক্ষ্য—যাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার সন্তোষ-সাধন। কিন্তু কেবল বাক্যে কি সন্তোষ-সাধন সন্তুষ্পর ? যথে যদি ‘প্রভু’ ‘প্রভু’ বলি, আব কার্য্যে যদি অন্ত্যায়াগার করি, প্রভু কি তাহাতে পরিতৃপ্ত হন ? একটা গল্প আছে ! এক উত্তান-স্বামী, আপনার উত্তানের কর্মের জন্য দুই জন ভূত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুই জনের উপর উত্তানের দুই দিকের কার্য্যতার স্থান ছিল। কিন্তু উত্তানের কার্য্যে গিয়া, একজন ভূত্য শুধুই উত্তান-স্বামীর গুণ-কীর্তনে রত থাকিত, উত্তানের কার্য্য বড় একটা দেখিত না ; অন্য দিকে, অপর ভূত্য, প্রভুর আদেশ-পালনে, উত্তানের বৃক্ষলণ-গুলিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ভীবন নিষেগ করিয়াছিল। ফলে, উত্তানের একটা দিক আগাঢ়ায় পরিপূর্ণ ও ধৰ্মস্থাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, এবং অপর দিক ফল-ফুলে শোভা বিশ্রার করিয়াছিল। এ অবস্থায়, উত্তান-স্বামী উত্তান দেখিতে আসিয়া, কোন্ ভূত্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন ? সহজেই বুঝা যায়, যে ভূত্য তাঁহার উত্তানের পারিপাট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তিনি তাহাকেই পুরস্কৃত করিবেন। এ ক্ষেত্রেও মেই ভাবই বুঝিতে হইবে। সংসার-রূপ উদ্যানে তিনি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন—তাঁহার উদ্যানের পারিপাট্য রক্ষার জন্য। উদ্দেশ্য—আগাঢ়াগুলিকে তুলিয়া ফেলিবে ; উদ্যান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে ; উদ্যানের আবর্জনা দূরে ফেলিয়া দিবে ; এবং ভাল ভাল ফুলফলের গাছগুলিকে সংযতে রক্ষা করিবে। তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ ; তাহাতেই তিনি পুরস্কৃত করিবেন।

* * *

এই মন্ত্রে দুই শ্রেণীর সাধকের দুই ভাব ব্যক্ত দেখি। এই মন্ত্রটিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রকৃতি যেরূপ পরিষ্কৃত, অসাধারণ মানুষের অসাধারণ শক্তি-প্রভাবও মেইরূপ পরিদৃশ্যমান ! যাহারা সাধারণ পছাবলস্থি, তাঁহাদের আহ্বান,—‘আমরা আপনার মহিমা কীর্তন করিতেছি ; আপনি আমাদের ঘজে আগমন করুন ; আপনার অধিষ্ঠানে আমাদের যজ্ঞ

সুসম্পন্ন হউক।' কিন্তু ধীহারা কর্মগার্গে অগ্রসর, জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা বলিতেছেন,—‘আমরা আমাদের কর্মপ্রভাবে আপ্নাকে এই যজ্ঞে আনয়ন করিবার প্রার্থী।’ আহ্বান উভয়েই করিতেছেন। এক জ্ঞানের আহ্বান—নৈরাশ্যব্যঙ্গক, অন্যের আহ্বান—আশা-আশ্঵াস-পূর্ণ। প্রথম শ্রেণীর সাধক অনুগ্রহ-প্রার্থী—দয়ার ভিত্তিরী। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক কেবল অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না; পরম্পরা সাধনা-প্রভাবে ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া আনাই তাঁহার কামনা।

* * *

যজ্ঞ—অস্তরে বাহিরে উভয়ত্রি আরম্ভ হইতে পারে। মনে করিতে পারি, যিনি যে তাবের ভাবুক, তিনি সেই ভাবেই ডাকিতেছেন,—‘হে সর্বব্যাপিনি ! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।’ হৃদয়ে ও যজ্ঞক্ষেত্রে উভয়ত্রই অভাব অনুভূত হইতে পারে। তিনি সর্বব্যাপী; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি অনুপস্থিত। তিনি থাকিতে পারেন—অস্তরিক্ষ-লোকে; তিনি থাকিতে পারেন—চুয়লোকে; তিনি থাকিতে পারেন—আদিত্য-মণ্ডলে; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) যে শূন্য পড়িয়া আছে ! সর্বত্র তিনি; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) শূন্য কেন ? এবিষ্ণব অনুভাবনার পরই কর্মে প্রবৃত্তি আসে। কর্ম প্রবৃত্তি, অবসাদ দূর করিয়া দেয়। এখানে সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বতরাং ডাকিবারও সামর্থ্য আণিয়াছে—‘যেখানে থাকুন, এই যজ্ঞে আগমন করুন।’

* * *

কৌর্তনে স্মরণে অনুধ্যানে কোনও স্ফুল যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। কৌর্তন স্মরণ অনুধ্যানাদির দ্বারা তৎকর্ম-সাধনে উত্থম আসে। কৌর্তনে স্মরণ হয়—প্রভু আমায় কি জন্ম নিয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে অনুধ্যান আসে—কেমন করিয়া মে কর্ম সম্পাদন করিব ! তখন কর্ম আরম্ভ হয়। পরে স্তরে স্তরে কর্মানুসারে আশা-আশ্঵াসের সঞ্চারে সমীপস্থ হইবার সামর্থ্য আসে।

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—:: ::—

ছা সুপর্ণা সবুজা মখারা সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তরোরস্যঃ পিগ্পলং স্বাদক্ষযনশ্চম্ভো অভিচাকশীতি ॥

এক বৃক্ষে ছুটা পক্ষী নিবসয়ে শ্বথে ।

একে ফলভোগ করে—অন্য মাত্র দেখে ॥

• • •

তিনি দেখিতেছেন। আমরা কর্মফল ভোগ করিতেছি। তাহায়ই অঙ্গীভূত অংশগত হইয়া আমরা কর্ম-ঘোরে আবক্ষ হইতেছি; তিনি যাত্র লক্ষ্য করিতেছেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না,—আপনার অজ্ঞাতসারে—মোহ-মরীচিকায় বিভাস্ত হইয়া—অপকর্মের পর অপকর্মের অমুষ্টান করিয়া যাইতেছি; কিন্তু অমেও একবার চাহিয়া দেখিতেছি না যে, একজন উপর হইতে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া রহিয়াছেন!

• • •

সেই দৃষ্টির প্রতি যদি লক্ষ্য পড়ে; আমাদিগের প্রতি কর্মে যদি দেখিতে পাই,—সেই এক জনের চক্ষু আমাদিগের প্রতি শৃঙ্খল রহিয়াছে; তাহা হইলে কখনও কোনও অপকর্মে আমাদিগের চিন্ত প্রবৃত্ত হইতে পারে না;—তাহা হইলে কখনও কোনও ভ্রাস্ত-পথে আমরা আর পরিচালিত হই না। জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই কর্ম-ঘোর কাটিয়া যায়। সেই দৃষ্টিই—পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিই জ্ঞানের নিকটে দৃশ্যতক্তে লইয়া যায়। সেই দৃষ্টির প্রভাবেই—জীব শুক্ষ্ম লাভ করে; ব্যক্তি সমষ্টিতে শিলিয়া যায়।

• • •

এ বিষয়ে হৃষির একটা গল্প আছে। পত্রাস্তর হইতে তাহা উন্নত করিতেছি। দুটা ছেলে একজন আচার্য্যের কাছে এসেছিল—ধৰ্ম শিক্ষা করুতে। আচার্য্য বললেন—পরীক্ষা না করে তিনি তাদের কিছু শিখাবেন না। এই বলে তিনি তাদের দুটা পায়রা দিয়ে বললেন,—“এমন জায়গায় গিয়ে এ পায়রা দুটা মারবে, যেখানে কেউ তোমাদের দেখতে না পায়।” এক জন তখনই লোক-চলাচলের মাঝে দিয়ে চলল। কত লোক যাচ্ছে আসুছে। সে তাদের দিকে পেছন ফিরে, একটা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে পায়রাটার মুশ ছিঁড়ে, আচার্য্যের কাছে এসে বলল—“প্রভু, আপনার আদেশ পালন করেছি।” আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন,—“পায়রাটা মারবার সময় কেউ তো তোমায় দেখতে পায়নি?” সে বলল,—“না। ওকে মারবার সময় আমি কাঙ্ককে দেখতে দিই-নি।” আচার্য্য কহিলেন,—“আচ্ছা, বেশ; দেখা যাক, তোমার সঙ্গীটা কি করেছে।”

* * *

তাহার সঙ্গীট—সেই অপর ছেলেটা—এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে যেই পায়রাটার ধার মোচকাতে যাবে, অমনি দেখে,—ওর টল্টলে চোখ-দুটী যে তারই পানে তাকিয়ে রয়েছে! ওই চোখ দুটীর পানে চেয়ে, সে পায়রাটার ঘাড় মোচকাতে গেল; কিন্তু পারল না—তার মনে ভয় এলো। হঠাৎ তার মনে হ'ল, আচার্য্য তো তাকে নেহাঁ সোজা কাজটা দেন-নি। সাক্ষী যে—দ্রষ্টা যে—সে যে এই পায়রাটির মাঝেও রয়েছে। “আমি তো একা নই—এ জায়গা তো এমন নয় যে,—কেউ আমায় দেখতে পাবে না!—কোথাই যাই—কি করি?” এই ভাবতে ভাবতে সে আর একটা জঙ্গলে গিয়ে সেখানেও যেই পায়রাটাকে মারতে যাবে, অমনি তার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ল—পায়রাটা যে দেখছে তাকে!—দ্রষ্টা যে পায়রার মাঝেই! বারবার সে পায়রাটাকে মারবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আচার্য্য তাকে যে ভাবে মারতে বলেছিলেন, সে ভাবে তো পারল না। হতাশ হয়ে সে পায়রাটাকে নিয়ে আচার্য্যের কাছে ধীরে ধীরে ফিরে এল!

* * *

আচার্য্যের পায়ের কাছে পায়রাটা রেখে, সে কেবলে বলল—“প্রভু, আপনি যা আদেশ করেছিলেন, তা আমি করতে পারু না। দয়া করে

আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন। এমন করে আর পরীক্ষা করবেন না। আমি পরীক্ষার যোগ্য নই। আমায় কৃপা করুন, কৃপা করে আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দেন; আমি তাই শুধু চাই।” আচার্য তখন ছেলেটাকে কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদুর করে বললেন,—“বাছা, আজ যেমন, যে পাখাটাকে মারতে গিয়েছিলে, তার চোখেও তুমি দ্রষ্টাকে দেখতে পেলে; তেমনি, যেখানেই যাও না কেন, যদি কথনও কোনও প্রলোভন আসে, কোনও আৎ কাজ করতে যাও, অমনি ভগবান্ যে তোমার সামনে, সে কথা শুরণে রেখো। যদি কোনও নারীর দিকে তোমার মন যায়, তবে তার দেহে তার চোখে সেই দ্রষ্টাকেই দেখতে শিখো;—তেনো, তোমার প্রভু তারই চোখ দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রভু তোমায় সব সময় দেখছেন। এমনি ভাব নিয়ে কাজ করো, যেন তুমি প্রভুর চোখের সামনে রয়েছ, মুখেমুখী হয়ে তাঁর কাছে দাঢ়িয়েছ—প্রিয়তমের দৃষ্টি তোমাকে এক পলের জন্যও ছেড়ে যায়-নি। বৎস, জেন,—ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।”

• • •

সংসারে যিনি যে কর্মেই প্রবৃত্ত হউন, প্রতি কর্মেই তাঁহার মনে করা উচিত,—তাঁহার অলক্ষ্যে এক জন সে কর্ম প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই জ্ঞান থাকিলে, মানুষকে কখনই বিভ্রমগ্রস্ত বা বিপন্ন হইতে হয় না। তাঁহারা ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহারা সর্বদাই উপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তঙ্গন্ত্য তাঁহাদিগকে কখনও মুহূর্মান হইতে হয় না। সকল শাস্ত্রই তারস্বতের এই কথাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।
প্রসন্নতঃ শ্রীমন্তাগবতের একটা শ্লোক উক্ত করিতেছি;
 “ধীরো ন মুহূর্তি মুকুল্মনিবিষ্টিচেতা পুজ্ঞামুপুজ্ঞবিষয়েক্ষণতৎপরোহপি।
 সঙ্গীতবাদ্যলয়তালিবশাং গতাপি মৌলিষ্ঠকুষ্ঠপরিলক্ষণধীনটীব ॥”

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃঃ—

সংক্ষেপিতা চিত্র মৰ্বাণ্ডাধি ইন্দ্ৰ বরেণ্যঃ ।

অমনিতে বিভু প্ৰভু ॥

তগোনের মিকট প্ৰার্থনাৰ সময়, মানবেৰ জীবন্যে সাধাৰণতঃ বিবিধ প্ৰথ-
তোগেৱ আকাঙ্ক্ষা জাগৰক হয় । প্ৰথমতঃ, তাৰামুখৰ উপযোগী
পৰ্যাপ্ত ধনৈৰ্থ্য চায় । দ্বিতীয়তঃ, সেই পৰ্যাপ্তেৱও অধিক—পার্থিৰ
ধনৈশৰ্ষ্যেৱ অতীত—অন্য ধন তাৰামুখৰ পাইবাৰ কামনা কৰে !

• • •

তোগেৱ আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত প্ৰকাৰেৱ । সে আকাঙ্ক্ষাৰ সৌমা নাই ।
সুতৰাং ধনাদিৰ প্ৰকাৰ-ভেদেৱও অবধি দেখি না । চাই—অৰ্থ, চাই—মণি-
মাণিক্য-হীৱা জহৰত, চাই—ঘৰ-বাড়ী গাড়ী-যুড়ী, চাই আসুবাৰ, পোষাক-
অট্টালিকা, চাই—মনোৱমা বনিতা আজ্ঞাবাহী দাসদামী, চাই আৱে কত
কি ! নিত্য-নৃতন আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষিত ধনেৱও বিচিত্ৰতা । এই
মন্ত্ৰে তাই ধনেৱ বিশেষণ দেখি—‘চিৰং’ (বিচিৰং মণিমুক্তাদিকং) ।
কেবল কি বৈচিত্ৰ্যে—বিবিধ ধনতোগেই—আকাঙ্ক্ষাৰ নিৰুত্তি আছে ?
তাৰা তো নহে ! মানুষ চায়—পৰ্যাপ্ত ! মন্ত্ৰ তাই ধনেৱ আৱ এক

ବିଶେଷଣ ଦିଲେନ—‘ବିଭୁ’, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗେର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ! ତୁମି କତ ଧନ
ଚାଓ ? ତୁମି କତ ଧନ ଭୋଗ କରିବେ ?

• • •

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତି ପାଇବେ ! କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରହେଲିକା ! ତାହାତେଓ ତୋ ଆକାଙ୍କ୍ଷା”
ମିଟିଲ ନା ! କୁଞ୍ଚିତ ହଇଯାଇ, ଉଦର ପୂରିଯା ଆହାର କର । ମିଷ୍ଟାମ ଚାଓ ?
ଏତ ପାଇବେ—ଯେ ଉଦରେ ସ୍ଥାନ ହଇବେ ନା । କୋନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରିତୃପ୍ତି-ସାଧନ
ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର ? ତୋମାର ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ—ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିତେ ଚାହିଁ ?
ସମ୍ମୁଖେ ଚାହିଁଯା ଦେଖ—ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନିକାରୀ ଏହି ବିଷ, ତୋମାର ନୟନ-
ଛୁଟିକେ ଏଥନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ସାଗରେ ଝୁବାଇଯା ରାଖିବେ । ତୋମାର ଓତ୍ତା ? ମେଇ
ବା କତୁକୁ ଶୁଷ୍ଵର ଶ୍ରୀବନେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା କରିବେ ପାରେ ? ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ—ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ—
ସକଳଇ ତୋ ତୋମାର ପୁରୋଭାଗେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଯାଇଛେ ।

• • •

ତୁ ତୋ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ମିଟେ ନା ! ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଲେଓ
ତୋ ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ନିର୍ବନ୍ଧି ହୟ ନା ! ଯତଇ କାମନାର ପୂରଣ ହୟ, ତତଇ ନୂତନ
ନୂତନ କାମନା ଆମିଯା ପୁରୋଭାଗେ ଦଶ୍ୟାୟମାନ ହୟ । କାମନାର ତୃଷ୍ଣାର କି
କଥନ ଓ ସୌମୀ ଆଛେ ? କାମନା କଥନ ଓ ମିଟେ ନା । ଆକାଙ୍କ୍ଷାର କଥନ ଓ
ନିର୍ବନ୍ଧି ନାହିଁ । ଶାନ୍ତି ତାଇ ବଲିଯାଇନ,—

“ନିଃସ୍ଵୋ ବ୍ୟକ୍ତିଶତଂ ଶତୀ ଦଶଶତଂ ଲକ୍ଷଃ ମହାଶ୍ରାଧିପୋ
ଲକ୍ଷେଶଃ କ୍ଷିତିପାଲତାଃ କ୍ଷିତିପତିଶ୍ଚକ୍ରେଷ୍ଟରତ୍ବଃ ପୁନଃ ।
ଚକ୍ରେଶଃ ପୁନରିନ୍ଦ୍ରତାଃ ଶୁରପତିତ୍ରାକ୍ଷାପଦଃ ବାହୁତି
ଅଙ୍ଗା ବିମୁପଦଃ ହରିରପଦଃ ତୃଷ୍ଣାବଧିଃ କୋ ଗତଃ ॥”

କାମନାର — ତୃଷ୍ଣାର କଥନ ନୀମୀ ନାହିଁ । ଯତଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ
ପ୍ରଦତ୍ତ ହଟ୍ଟକ, କାମନା କଥନ ମିଟିବେ ନା ; ନିତ୍ୟ-ନୂତନ କାମନା ଆମିଯା
ମାନୁଷଙ୍କେ ବ୍ୟତିବ୍ୟକ୍ତ କରିଯା ତୁଲିବେଇ ତୁଲିବେ ।

• • •

ତବେଇ ଚାଇ—ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତର ଅତୀତ ଧନ । ମନ୍ତ୍ର ତାଇ ବଲିଲେନ,—
‘ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତର ଉପରେର ଧନ ଓ ତୀହାର ଆଛେ ।’ ମେ ଧନେର ନାମ—‘ପ୍ରଭୁ’ ।
ବିଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ଧର୍ମସର୍ବର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଲେଓ ତୋ ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ନିର୍ବନ୍ଧି
ହଇବେ ନା ! ତଥାନ, ମେଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତର ଅତୀତ ଧନ ସଂଗ୍ରହେର ଜୟ ଚେଷ୍ଟା କରିତେ

হইবে। সে ধন প্রাপ্তি হইলে, তখন আর কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন করিবে না,—তখন সকল কামনার অবসান হইবে, সকল তৃক্ষয় পরিতৃপ্তি আসিবে। ফলতঃ, প্রার্থী হও—তাহার স্বারে। সকল ধনই তাহার নিকটে আছে। তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট তাহাই তুমি প্রাপ্তি হইবে। অসার মণিশূক্তাদি-রূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন—গ্রেষ্ঠন—মোক্ষধন অবধি—প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

* * *

সংসারী সাধারণ মানুষ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্মফলানুরূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্তি হয় না, তাহা নহে। তবে সে ধন যতই প্রাপ্তি হয়, কামনা ততই বাড়ে; আর, সেই কামনা-বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নৃতন দুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। শেষে এমন হয় যে, তাহাদের অর্জিত অর্থই যত অনর্থের মুল হইয়া দাঢ়ায়। তখন, ধন উপভোগ করিবে কি, ধনই শক্তি হয়।

* * *

উপভোগের ছইটা দিক্ আছে। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ-প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে স্বৈরের্য্য-সন্তোগে প্রয়াস পায়,—উপভোগের এই এক দিক্। আর এক দিক্—ভগবানে ঘৃতচিত্ত হইয়া—তাহার দান মনে করিয়া—তাহারই কর্মে নিয়োগ হওয়া! যত্ক্রে শেষোক্ত-রূপ কর্মাচরণের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র বিবিধ ধন, পর্যাপ্ত ধন, আর পর্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরম্পর, যদি তুমি তাহার নিকট বিবিধ পর্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্তি হইতে পারিবে।

* * *

ছই দিকে ছই পথ! এক পথ ডাক্তিতেছে,—‘চলিয়া এস! কাহারও অপেক্ষা করিও না! আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত

হইবে।’ কিন্তু অন্য পথ কহিতেছে,—‘না—না, তেমন কাজ করিও না, অজ্ঞান আচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না, পথে কত বিষ-বিপত্তি আছে; স্মৃতিরাং এক জনের আশ্চর্য লইয়া অগ্রসর হও।’ এ মন্ত্র সেই আশ্চর্য লওয়ার কথাই বলিয়াছে। বলিয়াছে—‘তাহার নিকট প্রার্থী হও; আজ্ঞ-পৌরুষ-রূপ অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূরণ করিবেন। কর্ম করিয়া যাও; কিন্তু কর্মের কর্তা যে তিনি, এই লক্ষ্য করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত রও।’

* * *

একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে—এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—‘তোমার ঐ সকাম প্রার্থনার মধ্য দ্বিয়াই তুমি নিষ্কাম আর্গে উপনীত হইবে। প্রার্থী হও—তাহার নিকট প্রার্থী হও—যিনি সকল ধনের অধিপতি! তোমার তোগের উপযোগী বিবিধ বিচিৎ ধনই তিনি পর্যাপ্ত দিতে পারিবেন; আবার, সে পর্যাপ্তের অতীত ধনও তাহার নিকট প্রাপ্ত হইবে।’ মনে হয়,—এই মন্ত্রে এখানে যেন একটা পর্যায়ের ভাব আছে। বিবিধ বিচিৎ চাহিতে চাহিতে, পর্যাপ্ত চাহিতে চাহিতে, সরে সরে, চাওয়ার শেষ-সীমান্ত উপনীত হইবে। স্মৃতিরাং যদি চাহিতে হয়, তাহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনাই তিনিই পূরণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন;— পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন।

• যন্তোর পরাবলী সহজ বোধগম্য হইবে,—এই উদ্দেশে বেদ-মন্ত্রের মৎস্য মৰ্মান্ত-সারিণী-ব্যাখ্যা হইতে উহার ব্যাখ্যা-বিব্লেষণ উন্নত করা যাইতেছে। যথা,—

‘ইঞ্জ’ (হে শঙ্খন) ‘তে’ (তব) ‘বিছু’ (তোমার পর্যাপ্ত) ‘অভু’ (ততোধিকং, তোমপর্যাপ্তাধিকং, অক্ষয়ং) ‘বাধঃ’ (ধনং) ‘অসং’ (অস্তি) ‘ইৎ’ (এব); ‘চিতৎ’ (বিচিৎ মণিমুক্তাধিকং) ‘ববেণ্যৎ’ (শ্রেষ্ঠং, অনিত্যপার্থিব্যনামোনাং অতীতং, নিত্যং ধনমিত্যর্থঃ) ‘অর্বাক্ত’ (অস্তুতিমুখং) ‘সক্ষেপযুক্ত’ (সম্যক্ প্রেরণ)। প্রার্থনামা ভাবঃ—‘হে শঙ্খন! যতস্মদেব নিত্যানিত্যোত্তৰবিদ্যনাধিপঃ, অতস্তাত্মপ্রস্তুত্যং প্রযচ্ছ।’

জ্ঞান-বেদ ।

মা মঃ শুনোহ অরুণৰূপো ধুর্জিঃ প্ৰণৱুৰ্জন্তু ।

রক্ষা ণো ব্ৰহ্মণস্পতে ॥

হে ব্ৰহ্মণস্পতি ! মনুষ্যস্মূলভ শক্রস্বরূপ হিংসা ও অভিশাপ আমা-
দিগকে ঘেন স্পৰ্শ কৱিতে না পারে । তাহাদিগেৱ কৰল
হইতে আমাদিগকে রক্ষা কৱন ।

ঈর্ষা, হিংসা, অভিশাপ—সংসাৱকে ঘেৱিয়া আছে । সংসাৱে যত কিছু
অশাস্তি, তাহাদিগেৱ প্ৰধান কাৱণ—ঈর্ষা, হিংসা, অভিশাপ । এ সংসাৱে
মনুষ্যেৱ বোধ হয় কোনও অশাস্তি থাকে না—যদি তাহারা ঈর্ষাৰ হিংসাৰ
অভিশাপেৱ কৰল হইতে যুক্ত থাকিতে পাৱেন । অপৱে আমাৰ প্ৰতি
ঈর্ষাস্থিত, অপৱে আমায় অভিশাপ প্ৰদান (আমাৰ বিদ্বা-গ্নান) কৱি-
তেছে,—ইহাৰ আমাৰ পক্ষে ঘেৱপ অশাস্তিৰ কাৱণ ; আবাৰ অপৱেৱ
প্ৰতি ঈর্ষাস্থিত হইয়া, অভিশাপ-বাক্য প্ৰয়োগ কৱিয়া, অন্তৱে অন্তৱে যে
জলিয়া পুড়িয়া মৱিতেছি,—তাহাৰ কি আমাৰ কষ অশাস্তি !

আমাদিগেৱ ছুঁথ—কিমেৱ জন্ম ? আমৱা যে অহৰ্নিশ ছুঁথ-দাবানলে
দৃষ্টিভূত হইতেছি, তাহাৰ কাৱণ কি ? কোনও ছুঁথ থাকিত কি—যদি
ঈর্ষা হিংসা না থাকিত ! আমি ভগুক্তিৰে বাস কৱি,—ছিল কছাই মাদেৱ
দাকুণ শীত কাটাইয়া দিতে পাৰি ; তাহাতে আমাৰ কোনও ক্লেশ অনুভূত
হইত না—যদি আমাৰ প্ৰতিবাসীৰ অঞ্চলিকা ও দুঃখকেণনিত শয্যা আমাৰ
দৃষ্টিকে ঝলসিয়া না দিত ! সেই তো আমাৰ ছুঁথ ! সেই তো আমাৰ

ক্ষোভ ! সেই তো আমার ক্লেশ ! পক্ষান্তরে, আমার অনশন-ক্লেশ ঘূচাইয়া আমি যখন দু-বেলা দু-মুঠা অম্বের সংস্থান করিতে সমর্থ হই, অন্যে কেন তখন সে অমগ্রামে হস্তানক হয় ?—অন্যের ঈর্ষা-ব্রহ্মে কেন তাহাতে বিপ্ল ঘটে ? এও এক বিষম দুঃখ ! ঈর্ষা-হিংসা ব্রহ্ম-অভিশাপ—আমার অন্তরের মধ্যে থাকিয়াও আমার ক্লেশ দিতেছে,—আবার আমার পারি-পার্শ্বিক বঙ্গুরগের মধ্যে বিশ্বান থাকিয়াও আমায় দংশন করিয়া ক্লেশ দিতেছে। জ্বালা দুই দিকেই ! তাই প্রার্থনা,—'হে ভগবন् ! আমার হৃদয়কে হিংসা-ব্রহ্ম-পরিশূল্য কর। সেই আশীর্বিষ রিপু যেন আমার হৃদয়কে কদাচ স্পর্শ করিতে না পারে। আমি যেন বাকে বা ব্যবহারে কখনও কাহারও প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ না করি; পরন্ত আমি যে অবস্থায় আছি, তাহাই যেন আমার স্বত্ত্বের ও আঝোড়োধের আদর্শ হয়।

* *

পরের শ্রীবৃন্দিতে মন কেন ব্যথা পায় ? যদি ভাবিয়া দেখি, ইহা বুঝিতে পারি না কি,—অনন্ত অক্ষণে বৃহত্ত্বের স্পর্ধাও কেহ করিতে পারে না, আবার ক্ষুদ্রত্বের শেষ-সীমায় উপনীত এলিয়াও কাহারও ক্ষোভ করিবার কোনও কারণ থাকে না। উপরের দিকে যতই দৃষ্টিপাত করিবে, কোথাও সীমা-রেখা দেখিতে পাইবে না; নিষ্ঠাভিমুখেও সীমান্ত-রেখা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া আছে, কেহই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে আর স্পর্ধাই বা কিসের ? তবে আর ক্ষোভই বা কি জন্ম ? দেখ দেখি—দুই দিকের দুই সীমা-রেখা কে অধিকার করিয়া আছেন ? মেও সেই তিনিই—যাহার অপেক্ষা ত্রৈ আর কেহ নাই ! সেও তো সেই তিনিই—যাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রও আর কেহ নাই। মহত্ত্বের ও ক্ষুদ্রত্বের দুই প্রাণে ‘মহত্ত্ব মহীয়ান’ এবং ‘অগোরণীয়ান’ হইয়া, দেখ দেখি, কে তিনি বিশ্বান রহিয়াছেন ? যদি স্বরূপ বুঝতে পারি, তাহা হইলে আর ক্ষোভ থাকে না। তাই প্রার্থনা,— হে অক্ষণস্পর্তি ! আমায় স্বরূপ আন দাও। যিনি ‘মহত্ত্ব মহীয়ান’ তিনিই যে আবার ‘অগোরণীয়ান’ হইয়া আছেন—এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমি যেন হিংসা-ব্রহ্ম অভিশাপ অস্তুতির সহিত সম্মত-শূল্য হইতে পারি।

জ্ঞান-বেদ ।

—:::—

সংগৃহীত সংবদ্ধবৎ সং বো মনাংশি জানতাম্ ।

দেবা ভাগঃ যথা পূর্বে সংজ্ঞানাঃ উপাপত্তে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সঘিতিঃ সমানৌ

সমানঃ মনঃ সহচিত্তযৈষাম্ ।

সমানঃ মন্ত্রমভিমন্ত্রমে বঃ

সমানেন বো ইবিষা জুহোমি ॥

সমানৌ ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমন্ত্র বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

কি বিষম দিনই আসিয়াছে এখন ! কেহই এখন আর এক পথে চলিতে চাহেন না । পিতা যে পথে চলিয়াছেন, পুত্র এখন তাহার বিপরীত পথে চলিতেছেন । গুরু যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, শিষ্য এখন আর সে পথ মানিতে চাহেন না । ভাই ভাই এখন ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতেছেন । পতি-পত্নীতে পর্যন্ত এখন গম্ভীর পথ লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে । হিন্দুর মধ্যে পথের ক্রিক্য নাই ! মুসলমানদিগের পথও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ! বৌদ্ধ, জৈন, শিখ—কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা কহিব—কেহই এখন আর আপন পথে চলিতে চাহেন না । বেদ তাই উপদেশ দিতেছেন,—“সংগচ্ছধৰং ।” যদি শ্রেয়ঃ চাও, এক পথের অনুসরণ কর—স্বর্ধমের আশ্রয় লও ।

* * *

এমনই কাল পড়িয়াছে এখন—এখন আর এক-বাক্য বলিতে কেহই প্রস্তুত নহেন ! পিতা এক বাক্য কহিবে ; পুত্র আর এক বাক্য কহিবে । সংসারের সকলেই বিভিন্ন বিপরীত বাক্য-কথনে যেন অভ্যন্ত হইয়া দাঢ়িয়াছে । কেবল তাহাই নহে ; প্রায় সকলেরই প্রকৃতি হইয়াছে এই যে,—তাহারা আজ এক কথা কহিবে, কাল আর এক কথা কহিবে ; তাহারা এখন যে বাক্য বলিবে, একটু পরেই আবার তাহা উণ্টাইয়া লইবে ! আরে !—সত্য যে এক, সত্য যে অপরিবর্তিত ! আজ যাহা সত্য, কালও যে তাহা সত্য, আবার যুগ্মুগ্নি পরেও যে তাহা সত্য । এ কথা বুঝিয়াও কেহ বুঝিবে না কি ? কালের প্রভাবে, মিথ্যার বন্ধা বহিয়া, দেশ ডুবাইয়া ভাসাইয়া দিল ! তাই এক-বাক্য-কথনে—সত্য কহিতে—কাহারও আর শক্তি নাই ! তোমরা এখনও যদি কালস্তোত্তে ডুবিয়া মরিতে না চাও, এখনও যদি শ্রেয়ঃ আকাঙ্ক্ষা কর ক্রি শুন, বেদ বলিতেছেন,—“সংবদ্ধধৰং ।” এক-বাক্য বল ; পিতা-পিতামহ যে বাক্য বলিয়া আসিয়াছেন, সেই বাক্য বল ;—সেই সত্যের, সেই ধর্মের, সেই কর্মের, সেই মন্ত্রের তোমরা উপাসক হও ।

* * *

কদাচ স্বধর্ম্ম-অষ্ট হইও না । হিন্দুকেও বলি, মুসলমানকেও বলি, বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-খ্রিস্টান সকলকেই বলি,—কদাচ কেহ স্বধর্ম্ম-অষ্ট হইও না ।

কোনও ধর্মই কখনও কুশিক্ষা দেয় না। কোন ধর্মই কাহাকেও যিথ্যা কহিতে উপুক্ত করে না। কোনও ধর্মই কখনও কাহারও প্রাণে ব্যথা দিতে শিক্ষা দেয় না। যে ধর্ম ধর্ম-নামে অভিহিত হয়, নিশ্চয়ই তাহা ~~সত্ত্বের~~ উপর—প্রেমের উপর—আতির বক্ষনের মধ্যে—প্রতিষ্ঠিত। সেখানে—হিংসা নাই, ব্রেষ্ট নাই, বিরোধ নাই, বিতঙ্গ নাই, পরপীড়নে স্পৃহা নাই। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু শোভনীয়, যাহা কিছু লোকহিতকর, সত্য-সরলতা-মহাপ্রাণতা-দয়াদাক্ষিণ্যাদি-গুণগ্রাম—সকলই সেখানে স্তরে স্তরে বিস্তৃত। দেবগণ দেবতাবসমূহ সেখানেই সমুপস্থিত হন। সেখানেই একমত্য। সেখানেই এক পথ। সেখানেই এক বাক্য কথন। সেখানেই—বেদ বলিতেছেন—“দেবাঃ উপাসতে।” সেখানেই দেবগণ সদাকাল বিশ্বান রহেন; সেখানেই ভগ্বানের আবির্ভাব হয়।

* * *

বর্তমান অবস্থায়, এই সঞ্চট সংগ্রামের দিনে, পরম্পরের এই বিষম বৈপরীত্যের মধ্যে, বিভিন্ন-পথে-গতিশীল বিপরীত-বাক্যকথনে-অভ্যাস-প্রাপ্ত এই জাতির জীবনে, কি শিক্ষা এখন প্রয়োজন? অনন্তের কোন্ত অনন্ত ব্যোম প্রতিখনিত করিয়া, অতীতের কোন্ত ছুরধিগম্য প্রাপ্ত বক্ষে করিয়া, মৃত-প্রাণে সংজীবনী-শক্তি সঞ্চারের জন্য, বেদ সেই শিক্ষার অমৃত-ধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বেদ বলিয়াছেন—“সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিক্ষিতমেষাম্।”

‘এক-মন এক-চিত্ত হও, এক মন্ত্র জপ কর, একই মন্ত্রণায় অমুপ্রাণিত হও।’ আর,

‘সমানং মন্ত্রমতিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জ্ঞুহোমি।’

‘এস, শক্রমিত্র যে যেখানে আছ—এস, একই মন্ত্রে মন্ত্রপূত করিয়া, একই মন্ত্রণায় অমুপ্রাণিত হইয়া, তোমরা আমরা সকলে, স্বধর্মে—দেববারে—ভগবৎকার্যে, আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করি।’ এইরূপ সঞ্চলে সঞ্চলাপ্তি হইয়া, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবক্ত হইয়া, এ জাতি যদি আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে; তবেই আবার—আবার সুদিন কিরিয়া আসিবে—এই হতাশারি ভাষণ অক্ষকারের মধ্যে আশার আলোক আবার উদ্ভাসিত হইবে,—তরং অক্ষণ আবার নবীন কিরণ বিচ্ছুরণ করিবেন।

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃঃ—

আশ্রিতকর্ণ শ্রদ্ধৌ হ্বৎ মু চিদ্ দথিষ্য মে গিরঃ ।

ইন্দ্র স্তোমমিযং যম কুবা মুজশিদস্ত্রৱং ॥

• • •

শ্রতিতে দেখি, অক্ষয় খরপ-বিষয়ে বলা হয়—“যচ্ছ্রাত্রেণ ন শৃণোতি
যেন শ্রোত্রমিদং প্রত্যম্ । তদেব অস্ম... ।” শ্রোত্র যাহাকে শ্রবণে পায়
না, পরম্পরা শ্রোত্রের যাহা হইতে শ্রোত্রস্ত, তাহাকেই এখানে “আশ্রিতকর্ণ”
শ্রতিসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । স্বতরাং লক্ষ্য নিশ্চয়ই
অনন্তসাধারণ মনে করিতে হইবে । তিনি স্ফুট ও অস্ফুট সকল স্বরই
শুনিতে পান । তিনি অস্তরের ও বাহিরের সকল ভাবই বুঝিতে পারেন ।
গোপনের কৃপরামর্শ ও প্রকাশের সন্তানগুলক বাক্য, তাহার নিকট কিছুই
অগোচর থাকে না । কেন-না, তিনি যে ‘আশ্রিতকর্ণ’ ।

• • •

মানুষ ভগবানের নিকট যে আর্থনা করে, সাধারণতঃ তাহাদের সেই
আর্থনার তিনটি সুর দৃষ্ট হয় । শীর্ষোক্ত মন্ত্র মানুষের সেই চরিত্র-
চিত্তের প্রতিজ্ঞবি ধারণ করিয়া আছেন । মন্ত্রে লক্ষ্য করুন, ব্যাকুল
সাধক প্রথমে কি আর্থনা করিতেছেন, আর পরেই বা কি আর্থনা করিলেন ।

তিনি প্রথমে কহিলেন,—‘হে দেব ! শুনুন—আমার প্রার্থনা শীঘ্ৰ শুনুন !’ পৰকল্পেই কহিলেন,—‘আমার এ প্রার্থনা একবাব হৃদয়ে স্থান দেন।’ শেষে জানাইলেন,—‘যদি আমার প্রার্থনা আপনার হৃদয়ে স্থান দেন, মে প্রার্থনা যেন মিত্রভাবে আপনার হৃদয়ে স্থান পায়, আমার প্রার্থনা যেন আপনার প্রিয়তর সামগ্ৰী মধ্যে গণ্য হয়।’

* * *

‘দুঃখপার্বীবাবে নিমজ্জনান् থাকিয়া, যত্নণায় অস্থির বিচঞ্চল হইয়া, মানুষ প্রথমে ভগবানকে এক ভাবে ডাকে। প্রার্থনা শুনিয়া, হৃষিত হইয়া, তিনি যেন দুঃখ দূর করেন,—প্রথমেই এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু, শুনিয়াও যথন মে প্রার্থনা ভগবান্ শুনিতে পান না, কর্মফল-রূপ যত্নণার অবশ্যন্তাবী ফলভোগের প্রতি তিনি যখন উদাসীন-ভাব প্রকাশ করেন, মানুষ তখন ভগবানকে আৱ এক ভাবে ডাকে ; ডাকিয়া বলে,—‘দয়াময়, আৱ যে সহিতে পারি না ! আমার প্রার্থনা আপনার হৃদয়ে একবাব স্থান দেন।’ কিন্তু মে আহ্বানও যখন শুফলপ্রসূ হয় না, তখন প্রার্থনা করে,—‘হে ভগবন्, এই করুন, আমার বাক্য বা প্রার্থনা যেন আপনার — শ্রীতিপদ হয়।’ মানুষের প্রার্থনার এই তিনি স্তুতি।

* * *

তিনি ‘আশ্রিতকর্ণ’, সমস্তই শুনিতে পাইতেছেন ;— এ বিশ্বাস যখন আসে ; তখন বুঝায়, মে প্রার্থনা তিনি শুনিতে পাইতেছেন, কিন্তু পূরণ করিতেছেন না। এইরূপ ভাব মনে উদয় হওয়ার পর, শুনিয়াও কেন শুনিতেছেন না—তাহার কারণ অচুসঙ্কানে ছেঁটা হয়। সেই চেষ্টার ফলে, গানুষ বুঝিতে পারে, তাহার প্রার্থনা—তাহার শুনিবার উপযোগী প্রার্থনা হয় নাই। তখনই বুঝিবার চেষ্টা হয়—কি হইলে বা কি প্রার্থনা করিলে তাহার শ্রবণযোগ্য প্রার্থনা হয়। তাহাতেই জ্ঞান আসে,—‘তাহার শ্রীতিজনক প্রার্থনা যাহা, তাহাই সম্ভত ও তাহার শ্রবণীয়।’

জ্ঞান-বেদ ।

— ১০৩ —

বিদ্যা হি তা বুধস্তমং বাজেয়ু ইবনশ্রুতং ।

বুধস্তমশ্চ হৃষে উতিঃ সহস্রসাতমাং ॥

• • *

হে ভগবন ! ‘তা’ (তাৎ) ‘বুধস্তং’ (কামানামতিশয়েন বর্তিতারং, প্রেষ্ঠকামন-পূরকং) ‘বাজেয়ু’ (অস্তর্ক্ষিঃসংগ্রামেয়ু) ; ‘ইবনশ্রুতং’ (অস্তৌইভাস্তামত প্রোতারং, অরিষমনকার্য্যে সহায় ইতি তাৎ) ; ‘বিদ্যা হি’ (জ্ঞানীয় এব) ; অতঃ ‘বুধস্তমশ্চ’ (ইটোখকস্ত) তথ ‘সহস্রসাতমাং’ (অশেবস্তমসাধিকাং) ‘উতিঃ’ (রক্ষাং—উদ্দিষ্ট ইতি বাথুৎ) ‘হৃষে’ (আহুর্গামঃ—বয়মিতি শেষঃ) । ভগবত্তং প্রেষ্ঠকামমাপূরকং অরিষমন-সহায়ং জ্ঞানা অশেবস্তমসাধিকাং রক্ষাঃ প্রোর্ধগ্নাম ইতি তাৎ ।

• • *

ভগবান् প্রেষ্ঠ কামনা পূরণ করেন । শক্তর সহিত সংগ্রামের সময় তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি নিশ্চয়ই সে আহ্বান সর্বদ্বা শুনিতে পান ।

• • *

কামনার অস্ত নাই । কিন্তু তিনি কামনাত্তপ্রেষ্ঠ অথবা প্রেষ্ঠ কামনার পূরণকর্তা । যে কামনা অস্ত কাহারও পূরণ করিবার সামর্থ্য নাই অথবা যে কামনা প্রেষ্ঠ কামনা, সে কামনা তাঁহারই দ্বারা পরিপূরিত হয় ।

• • *

কামনার প্রেষ্ঠ কোন্ কামনা, আর অন্যে পূরণ করিতে পারে না—
কোন্ কামনা, তাহা বুবিবার পক্ষে চেষ্টা পাইলেই স্বরূপ অবগত হওয়া
যায় । প্রেষ্ঠ কামনা—মোক্ষ বা মুক্তি । সে কামনা পূরণ করিতে পারেন—
একমাত্র ভগবান । ভগবৎসমগ্রে সেই তাৰই পরিব্যক্ত ।

• • *

সংগ্রাম অন্তরে ও বাহিরে দুই দিকে দুই ভাবে চলিয়াছে। শক্র—মানা-প্রকারের। যে কোনও শক্রের সহিত যে ভাবেই যুদ্ধ আরম্ভ হউক, ভগবানে শরণাপন্ন হইলে, তিনি শক্র-বিমুক্তনে সহায় হন। এ ক্ষেত্রে আমরা মনুষ্য শক্রের সহিত মনুষ্যের সংগ্রাম অপেক্ষা অন্তঃশক্রের সহিত আর্মাদের যে নিত্য সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহারই বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। সেখানে তাহার সহায়তা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়।

• • •

মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাধিলে উভয় পক্ষেই তাহাকে আহ্বান করিতে পারে। এরপ স্থলে তিনি কোন পক্ষে সহায়তা করিবেন? বলিতে পার,—‘ম্যায়-পক্ষ ও অন্যায়-পক্ষ দুই পক্ষ আছে; তিনি মেই বুঝিয়া ম্যায়-পক্ষ অবলম্বন করিবেন।’ কিন্তু তাহাতে আহ্বানের সার্থকতা কোথায় রাখিল? পরস্ত দুই পক্ষই ম্যায়বান ধর্মপরায়ণ হইতেও তো পারেন! সে ক্ষেত্রেই বা কি সিদ্ধান্ত করিবেন—বুঝিব?

• • •

এরপভাবে বিচারে দয়াবয় ভগবানের কার্য্যেও পদপাতিষ্ঠ-দোষ আরোপ করা যাইতে পারে। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করি, এ যুদ্ধ—মে যুদ্ধ নহে; যে নিত্যসংগ্রাম অনন্তকাল ষ্যাপিয়া চলিয়াছে, যত্নে মেই সংগ্রামেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। সে সংগ্রামে ভগবানের সাহায্য-প্রার্থী এক-পক্ষ মাত্র হইতে পারে; আর সে সংগ্রামে সহায়তার প্রার্থনা করিলে, ভগবানের করুণার ধারা স্বতঃই প্রার্থীর সাহায্যার্থ প্রবাহিত হয়।

• • •

বুঝিয়া দেখুন—সে সংগ্রাম কোন সংগ্রাম? তোমার আমার সকলেরই জন্মের মধ্যে সম্ভূতির সহিত অসম্ভূতির বেঁধোরতর ইন্দ্র চলিয়াছে, যত্নে মেই দ্বন্দ্বেরই আভাস আছে। তুমি সম্মার্গগামী হইতে চাহিবে; অসম্ভূতি তোমায় বাধা দিতে আসিবে; ঘোর ইন্দ্র উপরিত হইবে। যত্নের উপদেশ,—‘সে সময় তুমি ভগবানের শরণ লইবে; সে দ্বন্দ্বে তুমি ভগবানকে আহ্বান করিলে, তিনি স্বনিশ্চয় তোমার সহায় হইবেন। তুমি ইন্দ্র দেখিতে পাইবে।’

— • —

জ্ঞান-বৈদ।

—ঃ ক * কঃ —

আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মনসানঃ সুতঃ পিব।

মৰ্যমায়ঃ প্ৰসূতিৱ কৃধী মহাৰাঘৰ্ষিং ॥

ধন-জন-ক্ষেৰ্ষ্য পুত্ৰ-বিজ্ঞ-শোৰ্য-বীৰ্য সকল-কূপ প্ৰাৰ্থনাৱ পৱ, সাধক
প্ৰাৰ্থনা কৱিতেছেন,—‘হে ভগবন् ! হে অভীষ্টপ্ৰদ ইন্দ্ৰদেৰ ! আমায়
সৎকৰ্মশীল প্ৰশংসনীয়’ আয়ুঃ দান কৰন,—আৱ আগাকে বিজিতেন্দ্ৰিয়
খৰি কৱিয়া তুলুন !’ মৰ্মার্থ এই যে,—‘আমি আয়ুঃ চাহি—ভোগেৱ জন্ম
নহে ; আমি আয়ুঃ চাহি—বাঁচিবাৱ শথেৱ জন্ম নহে ; আমি আয়ুঃ
চাহি এগন,—মে আয়ুঃ যেন নব্য অভিনব সৎকৰ্মশীল প্ৰশংসনীয় হয় ;
আমি আয়ুঃ চাহি এমন,—মে আয়ুঃ যেন আমায় খৰিত্বে লইয়া যায় । যদি
আমায় আয়ুঃ দেও, যদি আমায় দাঁচাইয়া রাখিবাৱ প্ৰয়োজন বোধ কৱ,
আমাৱ জীবন যেন সৎকৰ্মে নিযোজিত থাকে, আমি যেন সৰ্বপ্ৰকাৱে
খৰি হইতে পাৱি, আমি যেন বিজিতেন্দ্ৰিয় হই, আমি যেন অভীন্দ্ৰিয় তোমাৱ
সহিত মিলিত হইতে পাৱি !’ এই তো মানুষেৱ মত প্ৰাৰ্থনা—এই তো
সাধকেৱ মত সাধনা ! কেমন ভাবে, কিৰূপ প্ৰাৰ্থনাৱ মধ্য দিয়া, সাধনাৱ
এই স্তুৱে সাধক-উপনীত হন, পৰ্যায়ক্ৰমে তাহা লক্ষ্য কৰন,—অন্তৱে
অন্তৱে অনুধাৰণ কৱিয়া দেখুন ।

— * —

জ্ঞান-বেদ !

— : * : —

পঁরি শ্বা গিৰবণো গিৱ ইমা ভবন্ত বিখ্তঃ ।
 | | . | |
 বন্দায়মনুষ্টয়ো জুষ্টা ভবন্ত জুষ্টয়ঃ ॥

সকল কৰ্ম্মে প্রযুজ্যমান আমাৰ স্তুতি যেন তোমাকে প্ৰাপ্ত হয় ; আমি
 যেন এমন অপকৰ্ম্ম কিছু না কৱি, যাহাৰ জন্য আমাৰ স্তুতি তোমাৰ নিকট
 উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয় ; আমি যেন তেমন কৰ্ম্ম কৱিতে পাৰি, যাহাতে
 নিঃসংক্ষেপে আমাৰ স্তুতি তোমাৰ নিকট পৌছিয়া যায় । পৰম্পৰা, ‘তোমাৰ
 সন্তোষ বৰ্কন কৱিয়া আমাৰ সন্তোষ হউক, তোমাৰ সেবায় তোমাৱই
 উদ্দেশে বিহিত সৎকৰ্ম্মে আমাৰ প্ৰীতি আহুক’। এ সকল ভাবেৰ কি
 তুলনা আছে ? এ ভাবেৰ এক প্ৰকৃট চিৰি—শ্ৰীমতী শ্ৰীৱাদা ; কিন্তু
 তিনি লোকাতীত—এখন আৱ এ লোকেৰ নহেন—গোলোকেৱ । শ্ৰী-
 প্ৰহ্লাদাদি হৱিপৰায়ণগণ—অধুনা উপাখ্যানেৰ আসন গ্ৰহণ কৱিয়া আছেন ।
 তবে আৱ কাহাৰ আদৰ্শ সমূথে ধৰি ? কে আৱ কহিবে এখন,—

‘তোমাৱি স্বথেতে আমুাৱি স্বথ,

তোমাৱি সেবায় প্ৰীতি পাই ।

তোমাৱি হাসি

অমিয় রাশি

হৃদয়ে ঘাথিয়া স্মিন্দ হই ।’

সৰ্বকৰ্ম্ম তাহাতে সমৰ্পণ ;—তাহারই কৰ্ম্ম তাহারই উদ্দেশ্যে সাধিত
 হইতেছে—এই মনে কৱিয়া কৰ্ম্মে প্ৰবৃত্ত হওন ;—এ তিম শ্ৰেষ্ঠ সাধন !
 সংসাৱীৱ পক্ষে আৱ কি হইতে পাৰে ?

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—ঁঁঁ * ঁঁঁ—

অগ্নিমা । । । ।
রয়িমশ্ববৎ পোষমেব দিবেদিবে ।

— । ।
যশস্ম বৌরবন্তমঃ ॥

সংসার কামনা-সাগরে নিমজ্জমান् । মানুষ কামনার দাস । সে
চায়—রূপ, সে চায়—ঐশ্বর্য, সে চায়—ধন-পুত্র, সে চায়—যশোগৌরথ ।
তার কামনার অন্ত নাই ! এই মন্ত্র—মানুষের সেই কামনার তৃপ্তিসাধন-কল্পে
প্রবর্তিত হইয়াছে । মানুষ যাহা চাহে, চিরকাল যাহা চাহিয়া আসিতেছে,
আজীবন যাহা চাহিবে, যে চাওয়া অসুরস্ত, যে চাওয়ার কথনও শেষ
নাই,—এই মন্ত্রে সেই চাওয়ারই অমুণ্ডণ করিতে বলা হইয়াছে !

অগ্নিদেবের উপাসনা কেন করিব ? উত্তরে বলা হইতেছে,—তাহার
অনুগ্রহে ষশঃ বৃদ্ধি হয় । যজ্ঞামুষ্ঠানে কেন অতী হইব ? বলা
হইতেছে,—অগ্নিদেবের উপাসনা-রূপ যজ্ঞামুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদিমহ
ধনরস্ত লাভ করা যায় । মানুষ !—তুমি ইহার অধিক আর কি চাহিতে
পার ? তোমার আকাঙ্ক্ষিত, তোমার কাম্য—সকলই তো তিনি প্রদান
করিবেন ! তবে আর তোমার কিসের অভাব ? তবে আর কেন তুমি
বিভ্রান্ত হইয়া ছুটিতেছ ? ভগবানকে উপাসনা কর ; তোমার সকল
কামনা পূর্ণ হইবে ! ভগবানের উপাসনার প্রতি মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট
করিবার পক্ষে ইহার অধিক আকর্ষক বাণী আর কি সন্দৰ্ভের হয় ?

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—বৈদিক কর্ম—যাগস্তোনির অনুষ্ঠান দ্বিবিধ উদ্দেশ্যমূলক। প্রযুক্ত ও নিরুত্ত ভেদে যত্ন দুই প্রকার। যে কর্মফলে ঐচ্ছিক স্থথ ও অভ্যন্তর্যাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রযুক্ত কর্ম কহে। আর যে কর্মফলে মুক্তি অধিগত হয়, তাহাকে নিরুত্ত-কর্ম বলে। কিবা ইহলোক সম্বন্ধে, কিবা পরলোক সম্বন্ধে কিবা যশঃ ও ঐশ্বর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে, কিবা স্বর্গাপবর্গ লাভের শাকাঙ্গায়,—যে কোনও কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই প্রযুক্ত কর্ম কহে। আর জ্ঞান-পূর্বক যে নিষ্কাগ কর্ম—যে কর্মে কোনও আকাঙ্ক্ষার সংশ্রেব নাই—মে কর্ম অনুবিল এবং বিষয়-সম্বন্ধ-শূণ্য, তাহাকেই নিরুত্ত কর্ম কহে। প্রযুক্ত কর্মের সম্যক অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি দেবগণের আসন লাভ করাও অসম্ভব নহে। যে কামনা করিয়া মানুষ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে, প্রযুক্ত কর্মের সম্যক সাধনার ফলে তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। নিরুত্ত কর্মাভ্যাসের ফলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া মানুষ স্থথ-হৃঢ়ের অতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। মেই অবস্থাই নিঃংগেয়সূ মোক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। মেই অবস্থাই আজ্ঞায আহ-সম্বিলন। প্রযুক্ত ও নিরুত্ত কর্মে ইহাই পার্থক্য। মন্ত্রে মেই প্রযুক্ত কর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

• • •

কর্ম দ্বারাই কর্ম-বক্তব্য ছিল করিতে হইবে। প্রযুক্ত কর্মই নিরুত্ত কর্মে লইয়া যাইবে। তাই প্রথম প্রয়োজন—শাস্ত্রবিহিত প্রযুক্ত কর্ম। শাস্ত্রানুস্ত প্রযুক্ত কর্মের ফলে অনুষ্ঠান-জনিত কর্মপ্রবাহে ক্রমশঃ নিরুত্ত-কর্মে প্রযুক্তি জন্মে। শ্রীমন্তগবদ্ধান্তায় শ্রীভগবান् যে কর্মতত্ত্ব বিরুত করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বরূপ উপলক্ষ হইলে, এই মন্ত্রের নিগৃতার্থ বোধগম্য হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—“কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবরোৎপত্তি মোহিতাঃ।” কোন্টী কর্ম, কোন্টী অকর্ম,—এ বিষয় বুঝিতে, সত্যই বিধেকৌ জনগণ মোহাঞ্চম হন। অনেক সময় বিভ্রমবশতঃ আমরা কর্মকে অকর্ম এবং অকর্মকে কর্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। বাস্পীয় যানে পরিদ্রমণকালে পার্শ্বস্থিত তরুরাজি সচল বলিয়া ভাস্তি জন্মে। দূরশ্বিত চন্দ্রদেব অচল বলিয়া প্রতীত হন। একে অকর্মে কর্ম, অপরে কর্মে অকর্ম। এই তত্ত্ব বিশদীকৃত করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ কর্মকে

ତିନ ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରିଯାଛେନ । ଏକଇ କର୍ମ ତନ୍ମୁଖରେ, କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମ ତ୍ରିବିଧ ସଂଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହିଁଯାଛେ । ତିନି ବଲିଯାଛେ,—କର୍ମକେ ବୁଝିତେ ହଇବେ, ଅକର୍ମକେ ବୁଝିତେ ହଇବେ, ଆର ବିକର୍ମକେ ବୁଝିତେ ହଇବେ । କର୍ମ କି ? କର୍ମ ବଲେ ତାହାକେହି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅନୁଗୋଦିତ । ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଆଦେଶ କରିଯାଛେ, ମେହି ଆଦେଶ ପାଲନ କରିବାର ଜୟ ଯାହା କରିବେ, ତାହାଇ କର୍ମ । ମେହି କର୍ମହି ତୋମାର ଶୁଭଫଳପ୍ରଦ । ଯେ କର୍ମ କରିତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିମେଧ କରିଯାଛେ, ଅର୍ଥାଏ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ, ତାହାରିଁ ନୀର୍ମ—ବିକର୍ମ । ମେ କର୍ମେ କଦାଚ ଶ୍ରେୟଃ ନାହିଁ । କୋନ୍ତେ କର୍ମ ନା କରା ଅର୍ଥାଏ ତୁଷ୍ଣୀତ୍ତାବ ଅବଲମ୍ବନ—ଅକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ୟ । ଏହି ଯେ ଅକର୍ମ—ଏହି ଯେ ତୁଷ୍ଣୀତ୍ତାବ ଅବଲମ୍ବନ, ଇହାରି ନାମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ । ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମହି ମୋକ୍ଷ ଅଧିଗତ ହୟ । ସକାମ କର୍ମହି ନିଷ୍କାମକର୍ମର ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶକ ।

* * *

ଅକର୍ମ ଅର୍ଥାଏ କର୍ମଶୂନ୍ୟତା ନୈକର୍ମ୍ୟ ବଲିଯା ଗଣ୍ୟ ହୟ । ଯେ ବିବେକୀ ଜନ, କର୍ମ, ବିକର୍ମ ଏବଂ ଅକର୍ମ—ଏହି ତିନେର ନିଗୃତ ଅର୍ପି ଅନୁଧାବନ କରିଯା ଅକର୍ମେ (ଅର୍ଥାଏ ସର୍ବବ୍ୟାପାରେ ନିଲିପି) ଥାକିତେ ପାରେନ, ତିନିହି ଧନ୍ୟ—ତାହାରି କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ଥକ । ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ ବଲିଯାଛେ,—

“କର୍ମଗୋହପି ବୋକ୍ତବାଂ ବୋକ୍ତବ୍ୟଃ ବିକର୍ମଗଃ ।

ଅକର୍ମଗଞ୍ଞାପି ବୋକ୍ତବାଂ ଗହନା କର୍ମଗୋ । ଗତିଃ ॥

କର୍ମଗ୍ୟକର୍ମ ସଃ ପଶ୍ୟେନ କର୍ମଗି ଚ କର୍ମ ସଃ ।

ସବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ମମୁଖ୍ୟେ ସ ଯୁକ୍ତଃ କୃତ୍ସନ୍କର୍ମହୃଦ ॥”

ଅକର୍ମେର ମଧ୍ୟେ ଯିନି କର୍ମ ଦେଖିତେ ପାନ, ଏବଂ କର୍ମେର ମଧ୍ୟେ ଯିନି ଅକର୍ମ (ନୈକର୍ମ୍ୟ) ଉପଲକ୍ଷ କରେନ, ତାହାରି ମକଳ କର୍ମବନ୍ଧନ ଛିମ୍ବ ହିଁଯାଛେ । କର୍ମେର ମଧ୍ୟେ ଅକର୍ମ (ନୈକର୍ମ୍ୟ) ଏବଂ ଅକର୍ମେର (ନୈକର୍ମ୍ୟର) ମଧ୍ୟେ କର୍ମ କି ପ୍ରକାରେ ଆମିତେ ପାରେ ? ଆର, କର୍ମ ଓ ଅକର୍ମ କି କରିଯାଇ ବା ବିକର୍ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତିତ ହୟ ? ଅକର୍ମ (ନୈକର୍ମ୍ୟ) ଅର୍ଥାଏ ତୁଷ୍ଣୀତ୍ତାବେର ମଧ୍ୟେ କର୍ମେର ସତ୍ତା ଏକଟୁ ଚିନ୍ତା କରିଲେଇ ଉପଲକ୍ଷ ହୟ । ଆମରା ଯଥନ ମନେ କରି,—‘ଆମରା ଚୁପ କରିଯା ସମୟା ଆଛି ; ଆମରା କୋନ୍ତେ କର୍ମ କରିବ ନା ; ତୁଷ୍ଣୀତ୍ତାବ-ଅବଲମ୍ବନେ ଆମରା ଦିନ କାଟାଇବ, ତଥନ କି କର୍ମାଭାବ ଉପହିତ ହୟ ? ତୁଷ୍ଣୀତ୍ତାବ ଅବଲମ୍ବନ—ଚୁପ କରିଯା ଥାକିବାର ଚେତୀ—ମେତେ

কি কর্ম নয় ? ‘আমি নিজিয় বসিয়া আছি ; কর্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না ;—এবষ্ঠিদ অমুভাবনা কি কর্ম নহে ?’ ‘অহঙ্কারাভি-ভূত মানুষই মনে করে,—‘আমি নিজিয় আছি।’ ফলতঃ, অকর্মের মধ্যেও কর্মের ক্রিয়া সম্ভাবে চলিয়াছে। এ সকল অহঙ্কারেরই লীলা খেলা। অহঙ্কার—অকর্মকেও বিকর্মে পরিণত করে। সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ কর্মত্যাগ করিয়া ঝনশূন্য নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছেন। দশ্ম্য-তাঢ়িত প্রাণিভয়-ভীত কোনও বিপন্ন জন ঊহার শরণাপন হট্টল ; আশ্রয় ভিক্ষা চাহিল ; প্রার্থনা জানাইল,—‘আমায় দশ্ম্য-হস্ত হইতে রক্ষা করুন।’ কিন্তু সাধুপুরুষ তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়া আঁচ্ছেন ; তিনি সেদিকে জ্ঞানে করিলেন না। মনে মনে কহিলেন,—‘কর্মত্যাগী আমি ; আমি কেন উহাকে ঊহার করিতে গিয়া কৰ্মবন্ধনে আবক্ষ হইব ?’ ঊহার সেই অমুভাবনার ফলে, ঊহার সেই অহঙ্কারের পরিণামে, আশ্রয়প্রার্থী জন দশ্ম্যহস্তে নিহত হইল। আর তাহার ফলে, সাধুর তুষ্ণীস্তাব-রূপ অকর্ম বিকর্মে পরিণত হইল। তপঃপরায়ণ সাধু কর্মফলে ‘নিরয়গামী ছইলেন ; ঊহার কর্ম অকর্মের ফল প্রদান করিল। এবশ্বেকারে কর্ম ও অকর্ম বিকর্মে পরিণত হয়, এবং কর্মের মধ্যেও অকর্ম ও অকর্মের মধ্যেও কর্ম সংশ্লিষ্ট সজ্ঞাটিত হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে আন্ত-বুদ্ধি মানুষের সিদ্ধান্ত অমুসরণ করা কদাচ কর্তব্য নহে ; পরন্তু মঙ্গবিধানী হইয়া অভ্রান্ত শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণ করাও বরং সহজগুণে শ্রেষ্ঠঃ।

* * *

শাস্ত্রানুরাগিত কর্ম, প্রবৃত্তহই হটক, আর নিরুত্তহই হটক, উভয়েই শুভ ফল প্রদান করে। কাম্য কর্মের মিন্দ। শতকৃষ্টে বিদ্যোষিত হটক ; তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। পরন্তু কাম্যকর্ম যদি শাস্ত্রানুসারী হয়, তাহার শুভফল কেহই রোধ করিতে পারে না। সেইরূপ, কর্মের ফলে কর্মাতীত মোক্ষ পর্যন্ত অধিগত হইতে পারে। ধনরত্নযশঃ আদি ঐশ্বর্যের কামনায় শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিতে করিতে ক্রমে আপনিই সে কামনা ভন্ধীভূত হয়। তখন প্রবৃত্ত কর্মের মধ্যেই নিরুত্ত কর্ম অধ্যয়িত হইয়া থাকে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—অগ্নিদেবের অনুগ্রহে প্রতিদিন যশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ কথা শ্রবণ সত্য। যাগ-ষজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে ‘ধার্মিক’

ବଲିଆ ଯେ ଲୋକିକ ସଥଃ, ତାହା ତୋ ଆଛେଇ । ଯଜ୍ଞାଦି ପୂଜାକର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଯା ଏ ସଂସାରେ କେ ମା ସମସ୍ତୀ ହଇଯା ଥାକେନ ? ଅଗିଦେବେର ଅନୁଗ୍ରହେ ଯେ ସଥଃ ଲାଭ ହୟ, ମେ ସଶେର ତୁଳନା ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷାର ଅନଳ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହିତେ ନା ପାରିଲେ, ସଥଃ କୋଥାୟ ଆଛେ ? ଅନଳେ ଦ୍ୱୀପୁତ ହଇଯାଇ କାଙ୍କନେର କାନ୍ତି ପରିବର୍କିତ ହୟ । ମା ଜାନକୀ—ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ—ଲୋକଲାଭହୃତା ମୀତାଦେବୀ—ଅଗି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବେଇ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟା ହଇଯା ଆଛେନ । ହରିପରାଶଗ ପ୍ରହଳାଦ ଭୀଷଣ ଅଗି ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵିଧାଇ ଆପନ ପୁଣ୍ୟମୂଳ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ରାଖିଯା ଗିଯାଛେନ । ସତ୍ୟଧର୍ମ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ମ ହରିଶ୍ଚମ୍ଭୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଭୃତି ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ନୃପତିବୁନ୍ ଅଗି-ପରୀକ୍ଷାର କି କଠୋର ଦହନଇ ସଙ୍ଗ୍ରହ କରିଯାଛିଲେନ ! ଅତୀତ-ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ମେ ମକଳ କାହିଁନି ଚିରଦିନ ସର୍ବକ୍ଷରେ ଆପନ ବକ୍ଷେ ଧାରଣ କରିଯା ରହିଯାଛେ । ଏ ସଂସାରେ ଅଗି ପରୀକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ସଥଃ କୋଥାଓ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ସଶୋଭାଜନ ହିତେ ହିଲେ, ଅଗି ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦିଯାଇ ମେ ସଥଃ ଲାଭ କରିତେ ହିବେ ! ସଶେ ଫଳ ଯେ କୀର୍ତ୍ତି, ତାହା ସ୍ଵର୍ଗ-ସଦମୁହଁତାନେଇ ଅନୁମାନୀ ହଇଯା ଆଛେ । ଭଗବତତ୍ତ୍ଵ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜନେର ସଥଃଧ୍ୟାତି କୋଥାର ନାହିଁ ? ମନ୍ତ୍ରେ ଆଛେ,—“ବୀରବତ୍ତମଂ ରଯିଃ ଅଶ୍ଵବଂ ।” ଭାଷ୍ୟକାରଗଣ ଅର୍ଥ କରେନ,—‘ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରାଦି ମହ ଧନରଷ୍ଟ ଲାଭ କରା ଯାଯା ।’ ଏହି ଅର୍ଥ—ସଂମାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟକେ ଧର୍ମାନୁମାନୀ କରିବାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ମ'ତ୍ର । ମଚେତ୍, ଏହି ଅଂଶେ ବଲା ହିତେଛେ,—ମେ ମେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ—ଯେ ଧନେର ଆର ତୁଳନା ନାହିଁ ; ମେ ମେହି ନିଃଶ୍ଵେତ୍ସ୍ମୀ ମୌକ୍ଷ ଧନ—ଯାହାର ଅଧିକ ଆର କାମନାର ବିଷୟ ନାହିଁ ; ଅଗିଦେବେର ଆରାଧନାୟ—ଜ୍ଞାନଦେବତାର ବା ଜ୍ଞାନାଧାର ଭଗବାନେର ଶରୀରପର ହେଯାଯ, ମେହି ଯୋଗିଧ୍ୟେ ପରମ ଧନ ଅଗୁଲ୍ୟ ରତନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯା ଯାଯ । ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରାଦିକୁ ଧନରଜ୍ଜ ସଂସାନ୍ତ୍ରୀ କାମ୍ୟ ହିତେ ପାରେ ; କିନ୍ତୁ ମେ ଧନେର ଆକାଙ୍କାୟ ଭଗବାନେର ଅନୁମରଣ କରିତେ କରିତେ ସଥନ ମେହି ନିତ୍ୟମତ୍ୟ ସମାତନ ପରମଧନେର ଅଧିକାରୀ ହେଯା ଯାଯ, ତଥନଇ ମକଳ ଆକାଙ୍କାର—ମକଳ କାମନାର ଅବସାନ ହୟ । ଏ ମନ୍ତ୍ରେ, କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଦିଯା, ମେହି ନୈକର୍ମ୍ୟର ଦିକେ ଅଗ୍ରମର କରିବାର ପର୍ବାଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହିଯାଛେ ।

জ্ঞান-বেদ ।

— ১০৬ —

তৎ ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো ।
ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥

কিবা লৌকিক জগতে, কিবা আধ্যাত্মিক জগতে, সর্বদা সখকালে
বিষম সংগ্রাম চলিয়াছে। সে সংগ্রামে কেহ জয়লাভ করিতেছে, কেহ
বিখ্যন্ত হইয়া পতনের অহলতলে নিমজ্জিত হইতেছে। কালরূপী রিপুগণ
সদাই প্রবল হইয়া আছে; কামক্রোধাদি সদাই মানুষকে অভিভূত করিয়া
ফেলিতেছে। তাই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির কামনার, সৎস্বরূপের করণ-
আকর্ষণের প্রয়াস। “বাজেষু বাজিনং”—তিনি অঙ্গুষ্ঠীয় ঘোড়া-পুরুষ—তিনি
অশেষ বলবন্ত। তিনি যদি হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন, তাহা হইলে জ্ঞানা-
কি? রিপু-দস্ত্য আপনিই পরাভূত হইবে; — জ্ঞান-সূর্যের বিষম আলোকে
হৃদয়ের অঙ্ককার আপনিই বিদূরিত হইবে।

• • •

সত্যজ্ঞানের অভাবই—অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দ্রঃখের আকর।
অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে, সত্যের নির্মল-জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট
না হইলে, গ্রেচোলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে

হইলে—রিপু-দষ্ট্যর নির্ভূল-সাধনে সমৃৎক থাকিলে,—সত্যের অনুসন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান—ধর্মের অনুসন্ধান—সংস্কৃতপের অনুস্মরণ। অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের দ্বারা লোক-সমৃহ ধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া আছে। যাহার ইহলোকিক ও পারলোকিক সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, তিনিই ধৃত বা সংরক্ষিত হন; অর্থাৎ—তিনিই মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। শান্ত্রোপদেশ হইতে বুঝা যায়,—একমাত্র সম্মত আশ্রয়েই সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়;—একমাত্র সত্যের সাহায্যেই শক্ত-সংহারের উপযোগী বলে বলীয়ান হওয়া সম্ভবপর।

* * *

সত্য-বল—ঞ্চেষ্ঠবল। সত্যের অনুসরণেই যদি সাধনার ধন লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সত্যের স্বরূপ কি বুঝিতে হইবে। যাহা সত্য, যেমন করিয়াই দেখ, তাহা কখনই অসত্য বা অসৎ হইতে পারে না। সত্য—জ্ঞানেরই নামান্তর। সত্যকে চিনিবার পক্ষে—জ্ঞানকে বুঝিবার পক্ষে—সত্যই প্রধান সহায়—জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে পাইতে পারি; জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান-লাভ হইতে পারে,—আলোক-সাহায্যেই আলোক-লাভ সম্ভবপর। আলোক-লাভ না হইলে—জ্ঞান-লাভ না হইলে—সত্যের অনুসরণ না করিলে,—কখনই সংস্কৃতপক্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

* * *

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“অজ্ঞান জন ভ্রমবশে সত্য-তত্ত্ব উপলক্ষি করিতে পারে না। অজ্ঞানাঙ্ক্যে মৃচ ব্যুক্তি, মে এই সংসারকে হৃদুর-প্রবাহিত বলিয়া ঘনে করে; তজ্জন্মই তাহা ক মধ্যে মধ্যে অলৌক দুঃসহ দুঃখ ও মিথ্যা-কল্পিত স্বর্থ অনুভব করিতে হয়। যেমন পরিস্কৃত ভূমি হইতে দুর্বাসুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তজ্জপ সুখস্পর্শ বৃক্ষ হইতে তীক্ষ্ণধার দুঃখস্পর্শ কণ্টকও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অজ্ঞানীর অস্তঃকরণে শত দিক হইতে শত শত বাসনার উদয় হইয়া থাকে। যে অজ্ঞ—যাহার চৈতন্য নাই, তাহার অস্তঃকরণও চৈতন্যশূন্য জড়—পরিদৃশ্যমান মৃত্তিকার স্থান অসার। মাটিতে সমস্তই জমে। অচৈতন্য পুরুষবীর বক্ষে জীবন-

বিশাখক বিষলতা ও জগিয়া থাকে;—সেও ফুলফলে নব নব পল্লবে কত
শোভা ধারণ করে। মুর্দে তাহা দেখিয়া বিশোহিত হয়। মুর্দের হৃদয়
স্মৃতিকার ঘ্যায় অসার। তাই তাহাতে কোম্বলপল্লবা বিষলতারূপিণী অঙ্গনা
বিলাসময়ী হইয়া শোভা পায়। সে লতায় অঙ্গনার চঞ্চল নয়নই চঞ্চল
ভ্রময়ী। সে ভ্রমনীর ঘোহকর বিলাসে তাহারা সর্বদাই চঞ্চল। তাহাদের
স্ফুরিত অধরই নবপল্লব। মুর্দে উহা দেখে, আর মোহিত হইয়া যায়।
জলময় সমুদ্র ভূমি তরঙ্গে নিয়তই অশান্ত। তাহার ছুঁথমুর্তি বাঢ়বানল-
রূপে তাহাকে কতই ছুঁথ দিয়া থাকে। সংসারে যে অঙ্গ, তাহারও সেই
দুর্গতি। যে জগৎ জ্ঞানীর চক্ষে অতি কোম্বল—অতি সুন্দর এবং যাহা
গোচরদের ঘ্যায় অত্যন্ত জলময় অতি শুন্দর এবং অনায়াসে পার হইবার
যোগ্য; সেই জগৎই অজ্ঞের পক্ষে অগাধ জলময় এবং একেবারে অপার।”
জ্ঞানলাভে অজ্ঞতা-দূর ভিন্ন, সে জলধি হইতে উক্তারের উপায় নাই!

* * *

মন্ত্রে যে সংগ্রামের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং যে সংগ্রামে
দেবতার নিকট সাহায্য-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; সংসারে অহনিশ
মেই স গ্রাম চলিয়াছে। পাপ-প্রলোভন নিয়ত মানুষকে আক্রমণ
করিতেছে; অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মানুষ সে আক্রমণে বাধা দিতে পারিতেছে
না। স্বতন্ত্র পুনঃপুনঃ পর্যাদন্ত হইতেছে।

* * *

এ অবস্থায়, প্রথম প্রয়োজন—পাপ-পুণ্যের, সত্যাসত্যের বা কর্মা-
কর্মের জ্ঞান-লাভ। সংগুরুর আশ্রয়, সৎকর্মের অনুষ্ঠান, সৎসঙ্গে
সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা—এতদ্বারাই যেই জ্ঞান লাভ হয়। যদি শ্রেয়ঃ
চাও, একে একে এই সকলের অনুবর্ত্তী হও।

— • —

জ্ঞান-বেদ

—ঃ কঃ * কঃ ——

রতাং সূন্তা উৎপুরক্ষৌরস্ত্বয়ঃ

শুশ্রানামো অস্তুঃ।

স্পার্হা বস্তুনি তমন্তপগুহ্না বিকুষ্ঠাষমো বিভাতীঃ

অনন্ত-বিসারী অজ্ঞান-পারাবার। চিন্তবৃত্তি বিপথে পরিচালিত।
কিরূপে উদ্ধার পাইব ?—কিরূপে সে তিগির-জাল ভেদ করিয়া উষার
আলোক লাভ করিব ? কোনু পথে যাইব ? কে সে পথের সঙ্কান
বলিয়া দিবে ? কেমন করিয়া অগ্রসর হইব।

* * *

সারাজীবন শোহপক্ষে নিমজ্জিত রহিলাম। সারাজীবন অজ্ঞান-তিমিরে
ডুবিয়া মরিলাম। অঙ্ককার—চারিদিকে অঙ্ককার। সে শোহঘোর কি
কাটিবে না ?—সে অঙ্ককারে কি আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইবে না ?—সে
পথের কি সঙ্কান গিলিবে না ?—এ জীবনে কি উদ্ধারের সন্তানবা নাই ?

* * *

মন চঞ্চল। চিত্তবৃক্ষি উচ্চার্গগামী। কিরপে উষাৰ আলোক লাভ কৱিব? কিৱপে অঙ্ককাৰে আলোক-ৱশি ফুটিয়া উঠিবে? সৎপথ—সৎপ্ৰসঙ্গ, সে তো বহুদিনই পৱিত্যক্ষ হইয়াছে! নিত্যসহচৰ যাহারা, তাহারা তো নিৱস্তুত বিপথে পৱিচালিত কৱিতেই উন্মুখ হইয়া আছে! সে প্ৰভাব খৰ্ব কৱিবাৰ সামৰ্থ্য কোথায়? সে প্ৰভাব খৰ্ব কৱিয়া কিৱপেই বংশুদ্ধাৰ পাইব? চঞ্চল মনকে—উচ্চার্গগামী চিত্তবৃক্ষি-সমৃহকে—সংযত কৱিয়া, কে.আংগীৰ পৱিত্ৰাণ সাধন কৱিবে?

* * *

অজ্ঞানাঙ্ক জীব সেইহৰশে স্বৰ্গ-শান্তিৰ অমৈষণে বিভ্রান্ত হয়। স্বৰ্গ-শান্তি-লাভেৰ আশায় সে বিভিন্ন পথে প্ৰধাৰিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্ৰকৃত স্বৰ্গ—প্ৰকৃত শান্তি কোথায় মিলিবে? যাহাকে স্বথেৰ নিৰ্দানভূত বলিয়া মনে হয়, পৱিণামে তাৰাই বিষেৰ্দিগিৱণ কৱে। ফলে, আপাতৎঃমধুৱ পৱিণাম-বিৱদ এবং আপাতৎঃবিৱদ পৱিণাম-মধুৱ সামগ্ৰীৰ আকৰ্ষণে বিকৰ্ষণে মুক্ত হইয়া সে বিভ্রান্ত হয়। বিভ্রান্ত হইয়া, তাই সে হতাশেৰ অনুর্দ্ধাৰে জৰ্জৰিত হইয়া মৰে।

* * *

এ অন্ত সেই হতাশায় সামুদ্রনা-দান কৱিতেছে। যশ্চ তাই প্ৰথমে সত্য-পৱায়ণ হইয়া সৎপথে গমনেৰ উপদেশ দিতেছে। তাৰ পৱ, সৎপৱায়ণ হইয়া চৈতন্য-সম্পাদক প্ৰজ্ঞান-জনক কৰ্মসূহেৰ অনুষ্ঠানেৰ উপদেশ দিতেছে। সৎকৰ্মপৱায়ণ হইয়া সদৃবস্তৱ অনুসন্ধানে প্ৰৱৃত্ত হইলে, প্ৰজ্ঞানপীঁ.উষাদেবী হৃদয়ে আবিৰ্ভূত হইয়া অঙ্ককাৰে আলোকৱশি বিকীৱণ কৱেন;—অজ্ঞানাঙ্ককাৰ-প্ৰচল ধৰ্মার্থকুমোক্ষ-ক্রপ চৃতুৰ্বৰ্গ-ফল প্ৰদান কৱেন। তথনই সাধনাৰ ধন—পৱমধন পাইবাৰ অধিকাৰ জশ্মে।

* * *

তবেই বুৰো যায়,—সদৃবস্তু প্ৰাণিৰ জন্য সত্যপৱায়ণ ও সৎপথাবলম্বী হইতে হইবে। তমোভাৱে সে সামগ্ৰী লাভ হয় না। তিনি সৎ; সৎসামগ্ৰীতেই তিনি সমাৰিত। সদৃবস্তৱ সমাবেশ ভিম, অন্তৰে তাহাৰ অধিষ্ঠান সন্তুবে কি? তাই সৎসূৰ্যকে পাইতে হইলে, সৎপথেৰ পথিক হইতে হইবে, সত্যকে আজ্ঞায় কৱিতে হইবে, অন্তৰে শুক্ৰবুদ্ধিৰ সমাবেশ

করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই তাহার স্বরূপ-জ্ঞান লাভে
সমর্থ হওয়া যোয় ; আর, তাহার স্বরূপ উপলক্ষি করিয়া তাহাকে অন্তরে
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

* * *

তাই মন্ত্রের উর্বোধন—‘মন, তুমি সৎপথাবলম্বী ও সত্যপরায়ণ হও।
চিরদিন অজ্ঞানাঙ্গকারে সমাচ্ছম রহিয়া কেবল পাপপক্ষেই মগ্ন রহিলে—
আর সময় নাই। একবার জ্ঞাননেত্র উশ্মীলিত কর। সে-জ্ঞাননেত্র লাভ
করিতে হইলে, প্রথমে তোমাকে সত্যপরায়ণ ও সৎপথাবলম্বী হইতে
হইবে। নচেৎ, তোমার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। যদি পরিত্রাণ লাভ
করিতে চাও, সত্যের অনুসরণ কর। সত্যের অনুসরণে, তোমার অন্তরে
চেতনাধায়ীনী উষার নবীন আলোক বিকীর্ণ হইবে ; আর সেই আলোক-
সাহায্যে আলোক ‘লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।’

* * *

কিন্তু সেই আলোক-সাহায্য লাভ করা বড়ই কঠিন। এ সংসার
এমনই বিষম স্থান, মোহ-মরীচিকা এখানে এমনই আধিপত্য বিস্তার করিয়া
আছে যে, পথ-নির্ণয় করা দ্রুঃসাধ্য, অনেক সময় আলেয়ার আলোর ঘায়
কুপ্রবৃত্তিশুলি পথ দেখাইয়া বিভ্রান্ত করে। তাহাদের কবল হইতে
পরিত্রাণ-লাভ বড়ই আয়াস-সাধ্য। সত্যের আশ্রয় অবলম্বন ভিম, সে
পক্ষে আর উপায়ান্তর নাই। শাস্ত্র তাই সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—
‘উষার আলোক লক্ষ্য কর ; সৎপথের পথিক হও।’

জ্ঞান-বেদ ।

—ঁঁ # ঁঁ—

চিৎং দেবানামুদগাননীকং চক্ষুর্ধিত্রস্ত বঁরুণস্তামেং ।

আপ্রা ত্বাবাপৃথিবৈ অমুরিকং সূর্য

আত্মা জগতস্তুষ্টুষ্ট ॥

• • •

এই দৃশ্যমান চরাচরের মধ্যে যে সকল তেজ পরিদৃষ্ট হইতেছে, (যেমন, অঘি, বরুণ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতির), এ সকল তেজের মূলে এক অমিক্রিচনীয় অধিশ তেজ দৃশ্যমান আছে। তেজের কেন্দ্র একটা। সেই কেন্দ্রীভূত তেজ হইতেই পরিব্যক্ত হইয়া এই দৃশ্যমান তেজঃসকল বিবিধভাবে ভৌবজগতে পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন এক জল, বহু প্রণালীর মধ্যে নানা বর্ণে বিচিত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে; যেমন এক অগ্নিধারা, বিবিধ আধারের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হইতে পারে; সেইরূপ এক গরমাজ্জ্বল্যাতিঃ বহুভাবে জগতের উপর আগম ক্ষেত্রাতিঃ একাশ করিয়া আছেন।

• • •

ଇହାକେ ବ୍ୟାଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟି ଛୁଇ ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ । ଥଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡ ତେଜକେ ବ୍ୟାଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟିଭୂତ ତେଜକେ ସମହି ବଲେ । ତାହା ଓ କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତେର ନହେ ; ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତେରଇ ଜଣ । ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତେ—“ନେହ ନାନାଁନ୍ତି କିଞ୍ଚିନେତି ଶ୍ରତି”—ବହୁତେର ଅବଭାସ ନାହି । ଯାହା କିଛୁ ବହୁତ, ତାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତେର । ଶୁତରାଂ ଏହ ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତେର ଯାହା କିଛୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ୍ ତେଜ ବହୁରୂପେ ପରିଲଙ୍ଘିତ ହିଉଥେଛେ, ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଏକ—, ଅଥଣ, ଅସୀମ ଓ ନିତ୍ୟ । ତଥାଯ ବହୁତେର ଲେଶ ନାହି । କେବଳ ଏକଙ୍କ ଓ ନିତ୍ୟ ଚିର-ବିରାଜମାନ । ବହୁତେର ମଧ୍ୟ ଦିଯା ମେହି ଏକଙ୍କକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରିଯାଇ ଏହ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ । ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖାଇତେଛେ ମେ,—‘ଏଥାନେ ତେଜ ଏକଟି ; ତବେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବହୁରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ୍ ହୟ, ଇହା ମେହି ଅଥଣ ପୁଣ୍ଡିଭୂତ ତେଜେରଇ ଅବଭାସ ।’ ଶୁତରାଂ ମେହି ଏକଇ ବ୍ୟକ୍ତଜ୍ୟୋତିଃ ବହୁଜ୍ୟୋତିଶ୍ୱାନ୍ ପଦାର୍ଥକେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଯା ଜ୍ୟୋତିଃ-ଧାରାଯ ବା ଜ୍ୟୋତିଃ-କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ଏହ ଜଗତେର ଅନ୍ତରାଳେ ନିୟତ ବିରାଜମାନ । ଏହ ମହାଭାବକେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇ ଏ ମନ୍ତ୍ରେର ପ୍ରଧାନତମ ଲଙ୍ଘ୍ୟ ବଲିଯା ବୁଝିତେ ପାରି ।

* * *

ଏହ ମନ୍ତ୍ର ଆକ୍ଷଣଗଣେର ସଙ୍କ୍ୟାବନ୍ଦନାର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପଥାନେର ଜଣ୍ଯ ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଇଛେ । କିନ୍ତୁ ମେ କୌନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ? ଦୃଶ୍ୟମାନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପହାନେର ଜଣ୍ଯ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଉନ୍ଦଗତ କରିବାର ଜଣ୍ଯ ଅଥବା ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଆହ୍ଵାନ କରିବାର ଜଣ୍ଯ— ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରେର ପ୍ରୟୋଗ ହିତ, ତାହା ହିଲେ କେବଳ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଏହ ମନ୍ତ୍ରେର ବ୍ୟବହାର ହିଲେଇ ଚଲିତ । ତ୍ରିମନ୍ତ୍ର୍ୟାୟ ଇହା ପାଠେର ଆବଶ୍ୟକତା କେନ ? ଫଳତଃ, ଏହ ମନ୍ତ୍ର ଏହ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରିଯା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନହେ । ଇହା ପରମାତ୍ମାକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରିଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିଯାଇଛେ । ସକଳ ଥଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡ ତେଜେର ଆଧାର ମେହି ଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରକାଶ ଅଥଣ ଅନିର୍ବିଚନ୍ନୀୟ ତେଜେର—ପୁନଃପୁନଃ ଶ୍ଵରଣ କରିତେ—ପୁନଃପୁନଃ ମନନ କରିତେ—ପୁନଃପୁନଃ ନିଦିବ୍ୟାନ (ଧ୍ୟାନ) କରିତେ— ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ସଙ୍କ୍ୟାବନ୍ଦନାର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମନ୍ତ୍ର୍ୟାୟ ପାଠିତ ହିଯା ଥାକେ । ଯଦି ପୁନଃ- ପୁନଃ ଶ୍ଵରଣ କରିତେ କରିତେ ମହାଭାବଟୀ ଫୁଟିଯା ଉଠେ, ଇହାଇ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରେର ସାକ୍ଷଳ୍ୟ । ନତେବେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ବା ସାମାନ୍ୟ ତେଜକେ ବା ଜ୍ୟୋତିକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରିତେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନହେ ।

* * *

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ—‘মিত্র, বরংণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ তেজোময় সূর্য উদিত হইয়া দ্যুলোককে পৃথিবীকে অন্তরিক্ষকে স্বীয় ক্ষিরণে উত্সাসিত করিয়াছেন। তিনি স্বাবর-জঙ্গম পদার্থের প্রাণতুল্য।’ মন্ত্রের সাধারণ ব্যাখ্যায় এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইলেও ইহার অভ্যন্তরে এক নিখৃঢ় তত্ত্ব-কথার অভিব্যক্তি আছে। দৃশ্যমান সূর্য—স্বাবর-অঙ্গমের মা হয় প্রাণতুল্য হইতে পারেন; কারণ, সূর্য-প্রকাশে সকল প্রাণীটি প্রাণলাভ করে; কিন্তু মিত্র বরংণ ও অগ্নি প্রভৃতির চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক—ইহার তাঁপর্য কি? সূর্যের প্রকাশক সূর্য—তাহাই বা কি প্রকার? এ সূর্যটি বা কে? আর, ইহার প্রকাশক সূর্যই বা কে? স্বতরাং ইহা চিন্তা করা কি উচিত নহে যে,—সূর্যের প্রকাশক যে সূর্য, অগ্নির প্রকাশক যে সূর্য—সে সূর্য কোন সূর্য? তিনিই পরমাত্মা! মন্ত্র ত্বো তাহাই পরিষ্কৃট হইয়াছে! “সূর্যঃ আজ্ঞা”—ইহাতে কি সূর্যকে পরমাত্মা বলা হইল না? অতএব, যে সূর্য নিখিল রশ্মিসমূহের বিদ্যোতক, যে সূর্য সূর্যের প্রকাশক, যে সূর্য বরংণের প্রকাশক, যে সূর্য অগ্নির প্রকাশক, যে সূর্য স্বর্গ মর্ত্য গগন স্বাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর উত্সাসক, সে সূর্য—পরমাত্মা, সে তেজঃ—পরমাত্মারাই। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ত্রিসংক্ষয়ায় সংক্ষ্যাবলম্বন।

* * *

তবে যে পরিদৃশ্যমান সূর্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহারও যে কারণ নাই, তাহা নহে। মানুষের ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ। তাই সসীমের মধ্য দিয়াই অসীমকে ধারণা করার প্রচেষ্টা; তাই দৃশ্যমানের মধ্য দিয়াই অদৃষ্টের সাক্ষাৎকার-লাভের প্রয়াস। যিনি বাঙ্গ-মনের অগোচর, যিনি নিরাকার নির্বিকার, যিনি অনন্ত অসীম অপার, তাঁহার উদ্দেশ্যে যে স্তুতি-নতি বিহিত হয়, তাঁহাতে যে নানারূপের পরিকল্পনা দেখিতে পাই, তাঁহার যে অবস্থানাদির নানা প্রকার নির্দেশ সংসৃচিত হয়; সে আর অন্য কিছুই নহে; সে কেবল—মানুষের ধ্যান-ধারণার ও বোধ-সৌকর্যের অন্ত্য। অনলে অনলে সলিলে—সর্বব্যাপী তিনি—সর্বত্রই তাঁহার বিভূতির বিদ্যমানতা। অতএব, তদ্বারাই তাঁহাতে উপস্থিত হওয়া ধার। তাই এই প্রকার উপাসনার প্রবর্তন।

— • —

জ্ঞান-বেদ।

—ঃ ক # কঃ —

ন হি ত্বা রোদসৌ উভে খৰায়মাণমিষ্টতঃ।

জ্ঞেষঃ স্বর্বতৌরপঃ সৎ গা অম্বভ্যঃ ধুরুহি॥

সংসারের চারিদিক শক্ততে ঘেরিয়া আছে। মানুষের শক্ত পদে
পদে। আধিব্যাধি-শোকতাপের মধ্য দিয়া শক্ত আসিয়া বিপন্ন করিতেছে।
আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ছুখ-রূপে মুর্তিমান् হইয়া শক্ত
আসিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। সকল শক্তির অপেক্ষা প্রথম শক্তি—আমাদের
সঙ্গের সাথী নিত্য-সহচর কামক্রোধাদি রিপুর্বগ্র।

মন্ত্র বলা হইয়াছে—‘শক্তসংহারের জন্য তগবানের যে মহিমা, তাহার
অস্ত নাই; স্বর্গলোকে ও মর্ত্যলোকে উভয় লোকেও সে মহিমা রাখিবার
স্থান-সঙ্কূলান হয় না।’ সত্যই তাই। রক্তবীজের বংশের স্থায় শক্তি—
মরিয়াও মরিতে চাহে না। তুমি কোনু দিকের কোনু শক্তি দমন করিবে?
সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষে উর্ক্ষদেশে অধোভাগে অগণ্য অসংখ্য শক্তি
লেলিহানজিহ্বায় তোমাকে আস করিতে আসিতেছে। এরূপ অগণিত
অধৃষ্য মহাপঞ্জাক্রান্তি শক্তি যিনি সংহার করিতে পারেন, তাহার ঘণ্টের অস্ত
আছে কি? মন্ত্র তাই বলিতেছেন—‘ন হি ইষ্টতঃ।’

ମନ୍ତ୍ରେର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶ—‘ସର୍ବତ୍ତଃ ଅପଃ ଜ୍ଞେୟः ।’ ଏଥାନେ ‘ଜଳ ଆୟ କରି
ବା ଜଳ ଦ୍ୱାନ କରି’ ସାଧାରଣତଃ ଏହିରୂପ ଅର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତ କରିବା ହ୍ୟ । କିନ୍ତୁ
‘ସର୍ବତ୍ତଃ’ ଶବ୍ଦେର ସାର୍ଥକତା ବୁଝିତେ ଗେଲେ, ବୁଝା ଯାଏ—ଏତଦ୍ରୁଗ୍ଭାଗରେ ‘ଅପଃ’
ସାଧାରଣ ଜଳ ନହେ; ଉହା ସର୍ଗେର ଅପ, ବା ଅମୃତ । ତୀହାରୀ ମରୁଭୂମିର
ଅଧିବାସୀ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଜଳେର ଜୟ ଶୁକ୍ଳକର୍ଣ୍ଣ, ତୀହାରେ ନିକଟ ସାଧାରଣ ଜଳଇ
ଅମୃତେର କାଜ କରିତେ ପାରେ; ତୀହାରୀ ‘ସର୍ବତ୍ତଃ ଅପଃ’ ଶବ୍ଦେ ସାଧାରଣ ଜଳ
ଅର୍ଥି ବୁଝିଯା—ଲୁଟ୍ରନ; ଜଳ ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଲେଇ ତୀହାରେ ପିପାସା ଦୂର
ହଇବେ, ହତରାଂ ତୃଷ୍ଣାରୂପ କଟ୍ଟଦାୟକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଇଯା ଯାଇବେ । କିନ୍ତୁ ଏକ
ରକମ ପିପାସା, ଏକବିଧ ତୃଷ୍ଣା, ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ହୋ—ମାନୁଷକେ ଗାତ୍ରମଣ
କରେ ନାହିଁ ! ନାନାନ୍ ରକମ ଶକ୍ତି—ନାନାନ୍ ଭାବେ ନାନାନ୍ ଦିକ ହିତେ ସେରିଯା
ଆଛେ । ତୀହାରେ ଆକ୍ରମଣ ହିତେ ଡ୍ରାରେର ଉପାସ କି ? ଶକ୍ତି-ସଂହାର
ଜୟ ଯେ ଭଗ୍ୟଧାରେ ଯଶଃ ସର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧରେ ନା, ଜୁଲଦାନେ ପିପାସା-ନିବାରଣ-ରୂପ
ଏଇ ସାମାଜ୍ୟ ଏକଟା ଶକ୍ତିଦମନ ଦ୍ଵାରାଇ କି ତୀହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହଇଯା ଯାଇବେ ?
କଥନାହିଁ ତାହା ମନେ କରିତେ ପାରି ନା । ଫଳତଃ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରକାରେର
ସକଳ ତୃଷ୍ଣା ବା ଦୁଃଖ ଦୂର ହ୍ୟ, ଅପ, ଶକ୍ତି ତୃହାରାଇ ଦ୍ୱୋତନା କରିତେଛେ ।
ହତରାଂ ମେ ଅପ, ଯେ କି, ତାହା ସହଜେଇ ବୋଧଗମ୍ୟ ହ୍ୟ । ମେ ଅପ—
ଅମୃତ; ମେ ଅପ—ଅମୃତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛୁଟ ନହେ; କେନ-ନା, ଗଲଳ
ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଦମନେର ବା ଜ୍ଞାନା ନିବାରଣେର ସାମଗ୍ରୀ ଅମୃତ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥାଂ
ଅମୃତର ଲାଭ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛୁଟ ନାହିଁ ।

• • •

ଏହିବାର ବୁଝିଯା ଦେଖୁନ—ମନ୍ତ୍ରେର ତୃତୀୟ ଅଂଶ—ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ କି ?
ମନ୍ତ୍ରେର ବାକ୍ୟ—‘ଗା: ସଂ ଧୂମୁହି ।’ ଇହୁତେ ସାଧାରଣତଃ ‘ଆମାଦିଗକେ ଗରୁ
ଦାନ କର’ ଭାବଇ ଉପଲକ ହ୍ୟ । ଆର ଏହି ଜୟାଇ ବେଦ—‘ଚାଷାର ଗାନ !’
କୃଷ୍ଣଜୀବୀ ଯଜ୍ଞମଧ୍ୟର ଅଭୀଷ୍ଟପୂରଣ-କାମନାୟ ଅମୁ ପ୍ରାଣିତ ହଇଯା ପୁରୋହିତ ସଥନ
ସ୍ତୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ତଥନ କୃଷ୍ଣର ସହାୟତାଶୂଳକ ଜଳ-ଦାନେର ବା
ଗରୁ-ଦାନେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେ ପାରେନ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତେର ପ୍ରାର୍ଥନାର
ସମୟ ଏଥାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ-ଭାବ ସୂଚିତ ହ୍ୟ ନା କି ? ବିଶେଷତଃ, ମନ୍ତ୍ରେର
ପ୍ରଥମାଂଶେର ଓ ମଧ୍ୟମାଂଶେର ସହିତ ସଙ୍ଗତି ରଙ୍ଗୀ କରିତେ ହଇଲେ, ଏହି ‘ଗା:’
ପଦେ ଏକମାତ୍ର ‘ଗରୁ’ ଅର୍ଥ ଆପିତେଇ ପାରେ ନା । ଗରୁ-ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଲେ,

କୟ ଦିକେର କୟଟା ଶତ୍ରୁ ଦର୍ଶିତ ହିବେ ? ଅଗଣ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଶତ୍ରୁ—ଦୁଃଖ-
ପାରାବାର ଆମାୟ ଘେରିଯା ଆଛେ ; ଦୁଇଟା ଗରୁ ପାଇଲେ, ଆମାର କତ୍ତୁକୁ
ଦୁଃଖ ଦୂର ହିବେ, ବା କୟଟା ଶତ୍ରୁ ବିମର୍ଦ୍ଦିତ ହିତେ ପାରିବେ ? ଶତ୍ରୁଦମନ ଜଣ୍ଯ
ସେ ଭଗବାନେର ସଶଃ ସର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧରେ ନା, ତୋହାର ନିକଟ ଆମି କି ଚାହିବ ?—
କି ଧନ ଦିଯା ତିନି ଆମାର ଦେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରିବେନ ? ସକଳ ଶତ୍ରୁର ନାଶେର ବା
ସକଳ ଦୁଃଖ ଅବସାନେର ନିର୍ମିତ୍ୟ—ଆମାର କି ଚାଇ ? ଚାଇ ନା କି—ଅଯୁତ-
ଆଦଶ୍ୱର ନହେ କି—ଅଯୁତତ୍ୱ ? ଅଯୁତତ୍ୱ-ପ୍ରାପ୍ତିଇ ଚରମ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତିନି
ଅଯୁତେର ଅଧିକାରୀ—ଅଯୁତ ସ୍ଵରୂପ । ତିନି ଜ୍ଞାନମୟ—ତିନି ଜ୍ଞାନାର୍ଥ ।
ମାନୁଷ ସତକଣ ନା ସେ ଅଯୁତେର ଅଧିକାରୀ ହ୍ୟ, ଆମରା ସତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେ
ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିତେ ପାରି, କଥନଇ ଆମାଦେର ଶତ୍ରୁନାଶ ସନ୍ତୋଷପର ନହେ ।
ଅଯୁତତ୍ୱ-ପ୍ରାପ୍ତି ସଟିଲେଇ ସର୍ବପ୍ରକାର କାମନା ହିତେ ବିମୁକ୍ତ ହୋଯା ଯାଏ,
କାମନା-ବିମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଶତ୍ରୁଇ ଛିନ୍ନ ହ୍ୟ । ତଥନଇ ଜୀବଶୂନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ।
ଅଯୁତ ଅବସ୍ଥାଯ ଶତ ଶତ୍ରୁଓ କିଛୁଇ କରିତେ ପାରେ ନା ।

ଏହି ଅଯୁତତ୍ୱ ବିଷୟେ ଉପନିଷତ୍ କହିଯାଛେ,—

‘ଅଯୁତତ୍ୱଃ ସମାପ୍ନୋତି ଯଦା କାମାନ୍ ସ ମୁଚ୍ୟତେ ।

ସର୍ବେଷଣମିର୍ଷି ତ୍ରିଶିଛତ୍ତା ତଃ ତୁ ନ ବଧ୍ୟତେ ।’

ଜୀବ ! ଯଦି ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ହିତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇତେ ଚାଣ, ଅଯୁତତ୍ୱ-
ଲାଭେର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାଓ । ଶତ୍ରୁଦମନେ ଅନନ୍ତ-ଶତ୍ରୁସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ୍ ସେଇ
ପ୍ରକଟ ଅନ୍ତରେ ତୋମାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେନ । ସେ ଅନ୍ତ ପାଇଲେ, ତଥନ ତୁମି
ସେଇ ଅବସ୍ଥାଯ ଉପନୀତ ହିବେ, ସେ ଅବସ୍ଥା—

‘ନିଷ୍ଠଲଂ ନିକ୍ରିୟଃ ଶାନ୍ତଃ ନିରବୟଃ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ।

ଅଯୁତତ୍ୱ ପରେ ସେତୁଂ ଦିନ୍ଦ୍ରିକନମିବାନଲମ୍ ।’

ତଥନ ଆଶା ଆକାଙ୍କ୍ଷା ତୃଷ୍ଣା ସକଳଇ ‘ଦିନ୍ଦ୍ରିକନ ଅନଳେର ଶ୍ୟାମ’ ଭଣ୍ଡୀ-
ଭୂତ ହିୟା ଯାଇବେ । ମନ୍ତ୍ରେର ଇହାଇ ନିଗୃତ ତାଙ୍କପର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ତାଙ୍କପର୍ଯ୍ୟଇ
ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାୟ ସର୍ବଧ୍ୟ ଅନୁଧାବନୀୟ ।

জ্ঞান-বেদ !

— ১০ —

ইখা হি মোম ইঘদে ত্রংকা চকার বর্কনম্ ।
— — —

শবিষ্ট বজ্রিমোজনা পৃথিব্যা নিঃ শশা ।
— — —

অহিমচ্ছমন্ত্র স্বরাজ্যম্ ॥ ১ ॥
— — —

স অমদুষ্মা মদঃ মোমঃ শ্বেনাভৃতঃ সুতঃ
— — —

যেনা বুত্ত নিরত্নে । জন্ম
— — —

বজ্রিমোজনাচ্ছমন্ত্র স্বরাজ্য ॥ ২ ॥
— — —

• • •

অধুনা ‘স্বরাজ’ ‘স্বরাজ’ বলিয়া একটা রূপ উঠিয়াছে। নানা দিকে নানা ভাবে ‘স্বরাজের’ নামে বাদ-বিতঙ্গ চলিয়াছে; নানা দিকে নানা পক্ষতত্ত্বে স্বরাজ-সম্পর্কে বিচার-বিতর্ক শুনা যাইতেছে। ব্যাখ্যা করা রকমেরই হইতেছে; কর্ত জনের কর্ত তৌক-বুকি কর্ত থেকারেই স্বরাজের

বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। হতরাং স্বরাজ-লাভের প্রচেষ্টাও বিভিন্ন বিপরীত ভাবে দেখা যাইতেছে। এ সময় আমরা যদি শান্তামুগ্রহ স্বরাজের ব্যাখ্যা করি, বেদান্তগত স্বরাজ বুঝাইবার চেষ্টা পাই, বোধ হয়, তাহা অসামাজিক ও অপ্রামাণিক হইবে না।

* * *

বেদে স্বরাজ্য (স্বরাজ) সংক্ষে একটা সূক্ষ্ম ঘোলটী মন্ত্র আছে। কি করিয়া কি উপর্যে স্বরাজ্য (স্বরাজ) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই মন্ত্র-কথেকটীতে তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গ-শীর্ষে যে মন্ত্র-ছুইটা উন্নত হইয়াছে, তাহাকে স্বরাজ্য-লাভের সোপান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র ছুইটা স্বরাজ-তত্ত্ব-পরিজ্ঞাপক এবং তত্ত্বিয়ক প্রার্থনা-মূলক। প্রথমে বুঝিয়া দেখুন—‘ঐ মন্ত্রের “প্রথম চরণে কি বলা হইয়াছে ! বলা হইয়াছে—‘উপাসক যখন বিদ্যুক্তমে যথাশাস্ত্র (ইত্যা) আনন্দপ্রদ (মন্দে) শুন্ধসন্ত্বে বা সৎকর্ম-সম্পাদনে (সোমে) পরিমগ্ন রহেন, তখন বিধাতা (ভূজ্ঞা) নিশ্চিত (হি) উপাসকের শেঁয়োবিধান বা শ্রীবৃক্ষসাধন (বৰ্দ্ধনং) করিয়া থাকেন (চকার)।’ এখানকার উপদেশ এই যে,—‘মানুষ ! তোমরা যথাশাস্ত্র সৎকর্ম-সম্পাদনে—শুন্ধসন্ত্বে প্রসূত হও ; বিধাতাই সর্বতোভাবে তোমাদিগের শ্রেষ্ঠঃসাধন করিবেন।’

* * *

সূচনায় সৎকর্ম-সাধনে উন্নুক অমুপ্রাণিত করিয়া, উপসংহারে মন্ত্রের বিভীষণ চরণে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘হে অমিত-বলশালিন् (শবিষ্ঠ) ! হে শক্তিবিনাশিন् (বজ্রিন্) ! আপনার শক্তির দ্বারা অথবা আমাদিগের প্রতি অমুকম্পা-প্রকাশে (ওজসা) ইহলোক হইতে (পৃথিব্যাঃ) সপ্ত-অকৃতিবিশিষ্ট ক্রুরস্বত্ত্বাদ রিপুকে অর্ধাং পাপকে (অহিং) নিরস্তর শাসন করুন—নিঃশেষে বিতাড়িত করুন (নিঃ শশাঃ)।’ এই প্রার্থনার মর্ম এই যে,—‘হে ভগবন् ! এই করুন—যেন রিপুগণ আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে—যেন পাপ আমাতে সংলিপ্ত না হয়।’ রিপুর আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিতে পারিলে, পাপের প্রভাব হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইলে, আপনিই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইস্বপে অর্ধাং পাপের প্রভাবকে দূরে রাখিয়া (অমু) স্বরাজ্য (স্বরাজ্যং) ইহজগতে

প্রতিষ্ঠিত হউক (অর্চন) ।' এখানকার “অহিমচ্ছমন্ত্ব স্বরাজ্যং” এই মন্ত্রাংশ হইতে প্রার্থনা-পক্ষে দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু সেই দ্বিবিধ অর্থেরই শর্ম অভিমন্ত্ব। সেই দ্বই অর্থ,—‘হে ভগবন् ! এই প্রকারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা (প্রকটন) করিয়া সর্পস্বত্ত্বাব পাপকে ইংলোক হইতে দূরীভূত করুন ।’ অথবা,—‘হে ভগবন् ! আমাদিগকে সৎকর্মে রত কৃয়ো, পাপ-সংস্কৰ হইতে দূরে রাখিয়া, এ সংসারে স্বরাজ্যের বা স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করুন ।’—ফলতঃ, রিপুর আক্রমণ হইতে আপনাকে বিছিন্ন রাখা অর্থাৎ পাপ-সংস্কৰ হইতে নিলিপ্ত থাকাই—স্বরাজ্য (স্বরাজ) লাভ। যে জন রিপুর বশীভূত নহেন, ভগবৎ-কৃপায় যিনি পাপকে দমন করিতে সমর্প হইয়াছেন, তিনিই স্বরাজ্য (স্বরাজ) লাভের অধিকারী হয়েন। আমাদিগের পরমপূজ্য বেদ এই তৎ প্রকাশ করিতেছেন।

* * *

এইরূপে প্রথম মন্ত্বে স্বরাজ-তত্ত্বের আভাস প্রদান-পূর্বক, দ্বিতীয় মন্ত্বে স্বরাজ-লাভ-পক্ষে আপনাকে উন্নুন্ত করা হইয়াছে। আমরা কেমন করিয়া স্বরাজ লাভের অধিকারী হইব ? কি করিয়া স্বরাজ আমাদিগের অধিগত হইবে ? মনকে বা আপনার আস্তাকে স্বরাজ-লাভ পক্ষে কিরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে ? দ্বিতীয় মন্ত্বে তাহাই প্রথ্যাত রহিয়াছে দেখিতে পাই,

* * *

উক্ত মন্ত্বেরও দ্বাইটা চরণে দ্বিবিধ ভাব প্রকাশমান। প্রথম চরণে আঝোদ্বোধনা এবং দ্বিতীয় চরণে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সেই আঝোদ্বোধনা ও প্রার্থনার মূলে স্বরাজ-তত্ত্ব প্রকটিত দেখিতে পাই। প্রথমে আপনার মনকে বা আপনাকে সম্বোধন-পূর্বক বলা হইয়াছে,—‘হে আমার মন ! অথবা হে আমার আস্তা ! অভীষ্টপূরক অর্থাৎ দ্বঃখনাশক (বৃষ্ট) আনন্দপ্রদ (মদঃ) ভগবানে ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক কর্তৃক আনন্দ অর্থাৎ সাধু-সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত (শ্রেণাভৃতঃ) বিশুল্প পৰিত্ব (স্ফৃতঃ) সেই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বরাজ্য-সংস্থাপক (সঃ) শুক্রসন্ততাব অথবা সৎকর্ম (সোমঃ) তোষাকে (ষষ্ঠী) আনন্দদান করুক (অমদঃ) ।’ এই আঝোদ্বোধনার শর্ম এই যে,—‘তুমি সাধুসংসর্গ লাভ কর ; সাধুগণের নিকট হইতে পৰিত্ব শুক্রসন্ততকে বা সৎকর্মকে প্রাপ্ত হও ; তাহাই

তোমার স্বরাজ্য-সংস্থাপক হইবে এবং তাহাই তোমাকে পরমানন্দ প্রদান করিবে।' সাধুগণের অনুসারী হইয়া, সৎকর্মের সমাধান করা এবং তদ্বারা শুক্ষমত্বের অধিকারী হওয়া—ইহাই স্বরাজ্য-লাভ। এখানে এই মন্ত্রাংশে এই তত্ত্বই অবগত হই—এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হই।

* * *

বিতীয় মন্ত্রের বিতীয় চরণে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—‘পাপ-নাশে দৃঢ়াযুধসম্পন্ন হে ভগবন् (বজ্জিনি) ! যে কারণে অর্থাৎ আমাদিগের সেই শুক্ষমত্ব-সম্পন্নতা-নিবন্ধন (যেন) আপনি আপনার বলের দ্বারা অথবা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশে (ওজসা) আমাদিগের শুক্ষমত্ব-সকাশ হইতে অথবা হৃদয় হইতে (অন্ত্যঃ) অজ্ঞানতা-রূপ অনুরক্তে (বুদ্ধিঃ) নিঃশেষে বিনাশ করেন—নিয়ত বিতাড়িত করেন (নিঃ জ্ঞয়স্ত) ; এবশ্বেকারে ইহজুগতে স্বরাজ্য প্রাপ্তিষ্ঠিত হউক (অর্চমন্ত্ব স্বরাজ্যম্)।’ এই প্রার্থনার মর্ম এই যে,—‘হে ভগবন् ! আমাদিগের অজ্ঞানতাকে দূর করুন ; রিপুন্যমুহকে বিনাশ করুন ; তদ্বারা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।’ এইরূপে বুঝা যায়, সাধুসঙ্গ-লাভে সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবানের কৃপায় অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় ; আর, তাহারই ফলে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমরা শুক্ষমত্বসম্পন্ন হইলে, আমরা সৎকম্প-পরায়ণ হইতে পারিলে, ভগবান् আপনার শক্তি বিকাশ করিয়া, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন-পূর্বক, আমাদিগের হৃদয় হইতে অথবা আমাদিগের শুক্ষমত্বের নিকট হইতে, অজ্ঞানতা-রূপ অনুরক্তে বিতাড়িত করেন। তাহার ফল কি হয় ? “অর্চমন্ত্ব স্বরাজ্যম্” মন্ত্রাংশ ইহাই ঘোতনা করিতেছে ! আমরা যদি সাধু-সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে দিনাতিপাতে প্রবৃত্ত হই, আমাদিগের মন যদি শুক্ষমত্বে পরিপূর্ণ হয়, আমরা যদি সৎকর্মের সাধনায় সর্বব্যাপ্ত থাকি, তাহা হইলে, তাহারই ফলে, ভগবান্ আমাদিগের অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া আমাদিগের পাপকে নাশ করিয়া, এ সংসারে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য। ইহাই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। সমর্থ হইবে কি—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠায় ?

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—::* * ::—

পুরুতবঃ পুরুণাযৌশানং বৌর্য্যাণাম্ ।

ইন্দ্ৰং সোমে সচাস্তে ॥

সংসার—স্বার্থ-বিমুক্তি । বিনা উদ্দেশ্যে—বিনা প্রয়োজনে, সে কোনও কার্য্যেই প্রযুক্ত হয় না । এতই স্বার্থাঙ্ক সে—যে, অঙ্গের অঙ্গস্তোষে সে তাহার মনের মত প্রয়োজন আরোপ করিয়া বসে । অতি তাই বলিয়াছেন,—“ন বা অরে পতুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি আত্মন্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি ।” তাই সচরাচর দেখিতে পাই,—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ভিন্ন কেহ কোনও কার্য্যে প্রযুক্ত হয় না । সকলেই প্রযুক্ত-কর্মের দাস ; নিযুক্ত-কর্মে কাহারও প্রযুক্তি নাই ।

কিন্তু প্রযুক্ত-কর্মের মধ্য দিয়াই নিযুক্ত-কর্মে উপনীত হইতে হইবে । স্বার্থসাধনের মধ্য দিয়াই পরার্থ-সাধনের, উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । কর্ম করিতে করিতেই কর্মত্যাগ করিতে হইবে । কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—শাস্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির এই ত্রিবিধ পক্ষ নির্দিষ্ট আছে । সেই তিনের মধ্যে আবার কর্মই প্রধান । কর্ম ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না ; জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির উদ্যম হয় না । সকলেরই মূল—কর্ম । সেই জন্য সকল শাস্ত্রেই কর্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত ; সেই জন্য, সংসারকে কর্মামুসারী করিবার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রের অশেষ প্রয়োজন দেখিতে পাই ।

ଶାଙ୍କ ସଲିଯାଛେন,—କର୍ମଇ ଧର୍ମ । କର୍ମଇ ତୀହାକେ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ମ । ଫଳଯାତ୍ରାଇ ସଥନ କର୍ମର ଅମୁସାରୀ, ଆର ଫଳଲାଭ-କାମନାଇ ସଥନ ମାନୁଷେର ସ୍ଵଭାବମିଳ, ତଥନ କର୍ମର ଅମୁଗ୍ନମ ଭିନ୍ନ ସଂସାରୀର ପ୍ରକୃତ ପଦ୍ମ ଆର କି ଆଛେ ? ନିର୍ବିଳାଇ ବଳ, ମୁକ୍ତିଇ ବଳ, ଭଗବନ-ସାମୀପ୍ୟଇ ବଳ,— କର୍ମ ହଇତେଇ ସକଳ ପଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୟ । ତାଇ ସଂସାରୀ ଜୀବକେ କର୍ମଠ କରିଯା, ତାହାକେ ତୀହାର ସାମୀପା-ଲାଭେର ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାର ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନେର ସତ କିଛୁ ପ୍ରୟାସ । ଅନୁଷ୍ଠାନ-କର୍ମୀ ତିନି ; ତାଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ-ଅରୁଣ-କୁପେ ବିକାଶ ପାଇଯା ତିନି ସଂସାରୀ ଜୀବକେ କର୍ମଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିତେଛେ । କର୍ମ ଆବାର ଉତ୍ୱକର୍ମର ଅମୁସାରୀ । ପ୍ରକୃତିର କର୍ମ—ୱର୍ଷାର ହର୍ଷି-ମୌଳିକ୍ୟର ଉତ୍ୱକର୍ମ-ସାଧନ । ମେଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି କର୍ମ-ନିରତ ରହିଯାଛେ । ପୁଣ୍ୟ-ସାଧନଇ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମର ଅନୁଭୂତି । ମେଇ ସୂତ୍ର ଧରିଯା କର୍ମ କରିଯା ଯାଇତେ ପାରିଲେଇ, ତୀହାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଯା ଯାଏ । ମେଇ କର୍ମ-ସୂତ୍ର ଯାହାତେ ସରଳ ମୁଗ୍ଧ ହ୍ୟ, ଶାଙ୍କେ ତୀହାର ଅଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଆଛେ । ମେଇ ଜ୍ଞାନ, ମେଇ କର୍ମ-ସୂତ୍ର ସରଳ ମୁଗ୍ଧ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟେଇ, ଭଗବାନେର ବିଭିନ୍ନ ମୁକ୍ତିର—ବିଭିନ୍ନ ନାମେର କର୍ମନା ହଇଯା ଥାକେ । ତାଇ ତିନି ପ୍ରେମଯ—ତାଇ ତିନି ପ୍ରେମ-ସ୍ଵରୂପ । ତୀହାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମାମୁର୍ତ୍ତାନୀ ହଇଯା ମାନୁଷ ଯେ କର୍ମର ଅମୁଷ୍ଟାନ କରିବେ, ମେଇ କର୍ମଇ—କର୍ମ, ମେଇ କର୍ମଇ— ଧର୍ମ ।

* * *

କିନ୍ତୁ ମେଇ କର୍ମାମୁଷ୍ଟାନେରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁରାଯ ଆଛେ । ମେଇ ସକଳ ଅନୁରାଯେର ବିଷୟ ଶୁଣଣ କରିଯା ପାଛେ କେହ ମେ ଅମୁଷ୍ଟାନେ ବିରତ ହ୍ୟ, ଏଇ ଆଶଙ୍କାୟ ମଜ୍ଜେ ବଳ ହଇଯାଛେ,—ତିନି ‘ପୁରୁତମଃ’ ଅର୍ଥାତ୍—ତିନି ବହୁ-ଶକ୍ତିନାଶକ । ତୁମି ତୀହାର କର୍ମର ଅମୁଷ୍ଟାନ କର; ତାହାତେ ଯଦି କୋନେ ବାଧା-ବିଷ୍ଣୁ-ଉପର୍ମିତ ହ୍ୟ, ମେ ବାଧା ତିନିଇ ଦୂର କରିବେନ । ତିନି ବହୁ ଶକ୍ତିର ନାଶକ; ତୋମାର ଶକ୍ତି-ସମୁଦ୍ରେ ତିନି ସଂହାର-ସାଧନ କରିବେନ । ତିନି ପୁରୁତମ; ତୋମାର ଭାବନା କିମେର ? ତୀହାର କର୍ମ ତିନିଇ କରାଇବେନ । ଉପଲକ୍ଷ ତୁମି; ତୁମି ତୀହାର କର୍ମ-ସମ୍ପାଦନେ ତେପର ହ୍ୟ । କର୍ମମୟ ସଂସାରେ ତୁମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ଥାକିଓ ନା । କର୍ମ କର—ତୀହାର ଶୈତିର ଜ୍ଞାନ; କର୍ମ କର—ତୀହାର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପରାୟନ ହଇବାର ଜ୍ଞାନ ।

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃঃ—

ঐভিরংশে ছবো গিরো। রিখেভিঃ মোমপীতং ।

দেবেভির্যাহি যক্ষ চ ॥

হে অগ্নিদেব ! মোম-গামের অত (উক্তমুখ্যা অহণের অষ্ট), আমাদের পরিচর্যার
ও জ্ঞানের নিকট, আমাদের অভিলাষাত্মকপ বিশের সর্বহেবতার সহিত,
আপনি আগমন করুন ; এবং (আসিয়া) আমাদের বজ্ঞ
সম্পাদন (অতীষ্ঠ-পূরণ) করিয়া দিউন ।

বিপদে পরিত্রাণ-লাভের আশায়, সম্পদে স্থুত্যুক্তির কামনায়, ছুঃখের
দহন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি করিবার আকৃজ্ঞায়, স্থুতের অবিরাম অচিহ্ন
প্রবাহ অপ্রতিহত রাধিবার শুণ্যায়, সকৃল সময়, সকল অবস্থায়, বিভিন্ন
দেবতাকে আহ্বান করার প্রয়োজন হয় । আস্তিক নাস্তিক সুকলেই
প্রকারাত্মের দেবতার আহ্বান করিয়া থাকেন । যাহারা দেবতার অস্তিত্ব
স্বীকার করেন না, আমরা মনে করি, তাহারাও দেবতারে ইতঃই প্রার্থ
হইয়া আছেন । ইহসংসারে এমন মমুক্য বিন্মল,—যাহারা কোন-না-কোনও
ভাবে দেবতার শরণাপন হয় নাই বা দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত নহে ।

• • *

দেবতার সহিত সম্বন্ধ কিছু-না-কিছু সকলেরই আছে। কিন্তু দেবতা যে কি বস্তু, তাহা অতি অল্প লোকই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা অতি অল্প-জনেরই ধারণা-পথে দেবতা উন্মাদিত হইয়াছে। দেবতা-বিষয়ক কিছুদস্তু নানা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। শাস্ত্রে দেখি, রূপকের কল্পনায় করিত আছে, দেবতা কত কত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কত কত স্থানে কত কত ভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। পুরাণে দেখি, লোক মুখে শুনি,—যজ্ঞে আমিয়া তাহারা যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, একের পক্ষ হইয়া অন্যের সংহার সাধনে প্রযত্নপূর রহিয়াছেন। দেবগণ-সম্বন্ধে এইরূপ যে কত কথাই প্রচারিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি কিন্তু সহসা হৃদগম্য হয় না যে, দেবতাই বা কি?—আর তাহাদের স্বরূপই বা কি? নিবিষ্টচিত্তে অমুধ্যান করিয়া দেখিলে, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যত কথা উল্লিখিত আছে—সকল কথার সামঞ্জস্য-সাধন লক্ষ্য করিতে হইলে, বুঝা যায় না কি,—দেবগণ স্বরূপতঃ কি? তাহারা শরীরী কি অশরীরী?

• • •

দেবগণ তোমার-আমার শ্যায় দেহধারী নহেন। তোমার প্রদত্ত স্তুল-উপাদানসূত ঐ অমুজল গ্রহণ করিতে অথবা যজ্ঞহবিঃ পান করিতে, তাহারা কখনও তোমার দৃশ্যান্ত স্তুলদেহে আমিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন না। চাকুষ-প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি সে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো যজ্ঞ হয়! বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো দেবতার উদ্দেশে ভক্ষ্য ভোজ্য ঘোড়শোপচার সাজাইয়া সেই মন্ত্রে সেই তাবেই দেবতার আহান্ত করা হয়! কিন্তু কৈ, কেহ দেখিয়া-ছেন কি,—কখনও কখনও কোথাও দেহধারী দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে! কমাচিং সে সংবাদ শুনিতে পাই। কেহ কখনও সে বিষয় মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারেন না। কেবল এখন বলিয়া নহে; কোনওকালে কখনও যজ্ঞক্ষেত্রে যে দেহধারী দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অনুভবে আসে না। পুরাণে রূপকে যে সকল ঘটনা পরিবর্ণিত আছে, তাহাও এ রাজ্যের নহে,—কল্পনার অতীত সে এক অস্ত রাজ্যের কাহিনী বলিয়াই মনে হয়।

• •

তবে কি ? যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে তবে কি বুঝিব ? কিরূপে কি ভাবেই বা যজ্ঞক্ষেত্রে তাহাদের অধিষ্ঠান হয় ? কেমন করিয়াই বা তাহারা কৃপা-বিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর-দান বড়ই কঠিন ; অল্পকথায়ও সে উত্তর ব্যক্ত হইবার নহে ; আবার যতই অধিক কথা কহিতে যাইবে, তাব গ্রহণ ততই অটিল হইয়া পড়িবে । এই সকল প্রশ্নের উত্তর—বাক্যে নহে—অনুভাবনায় ; বক্তৃতায় নহে—অনুধ্যানে ; ভাষায় নহে—চিন্তায় । তখাপি প্রসঙ্গতঃ সংস্কেপে বিষয়টা একটু বিস্তার করিবার প্রয়োগ পাইতেছি । মনে রাখিবেন,— দেবগণ দেহধারী নহেন—অশৰীরী—শুক্ষসূক্ষুরূপে তাহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্বত্র বিশ্বমান আছেন ও বিচরণ করিতেছেন । তেজোরূপে, বায়ু-রূপে, অপ-রূপে, সত্য-রূপে, সংস্কৰণীপে, তাহাদের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে । প্রাণ তোমার যে ভাবে তাহাদের পাইতে, চাহিবে, সেই ভাবের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমাণু-রূপে আসিয়া তাহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন । বীজটাকে তুমি যখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রোপণ কর, তাহ'কে মুকুলিত মুঘরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে আসিয়া সহায়তা করে ? ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না ; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটাকে নবজীবন প্রদান করে ; কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না, এমনই ভাবে কর্ম স্থস্থপন হইয়া যায় । যজ্ঞাদি কর্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ-সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে । তোমার বীজবপন-রূপ কর্ম আরম্ভ হইলে, তোমার দেহ-মনঃপ্রাণ এক হইয়া সদমুর্ত্তানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব-দেবগণ—তাহাদের সূক্ষ্মসূত্র ভাব-বিভূতি—তোমার সর্বপ্রকার সদ্ব্রত্ন-সন্তানের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে একট হইবেন । দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে । হস্তয়ে দেবতাবের বিকাশই দেবাধিষ্ঠান ।

* * *

অতঃপর দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ কি প্রকারে স্বাপিত হয়, একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাইক । বলিয়াছি,—দেবগণ অশৰীরী, শুক্ষসূক্ষভাবে সূক্ষ্মাদেহে বিশ্বমান আছেন । দেহধারী শরীরী জীবের সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে, শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে । সুলেৱ

সংস্কৃত শুলের সহিত সাধিত হয়। কিন্তু যাহা শুলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে, সে কি শুলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? কখনই না। সেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তা আবশ্যিক করে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দ্রুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জগতে যে কৃশ্চের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জগতের পক্ষে সে কর্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। শুলের পক্ষে এক, সূক্ষ্মের পক্ষে এক, বহির্জগতের পক্ষে এক, অন্তর্জগতের পক্ষে এক;— বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্য-কারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহা দৈহিক বলের আবশ্যিক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। মনে করুন, সম্মুখে একটা মোট পড়িয়া আছে; আমাকে তাহা বহন করিতে হইবে। এখানে আমার দৈহিক শক্তির কার্য্য আবশ্যিক। কেবল মানসিক শক্তি প্রয়োগে কোনরূপ ফললাভ সম্ভব নহে। কিন্তু মানসিক শক্তি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আবার দেখুন! আমায় একটা বেদমন্ত্র শুনুণ করিতে হইবে। সেখানে শত দৈহিক শক্তিতে কোনও কাজ হইবে না। একভাব—পরিদৃশ্যমান; অপর ভাব—অ-দৃষ্ট। শুল-সূক্ষ্মের কার্য্য-শূলতঃ এই দৃষ্টান্তেই বোধগম্য হইতে পারে। অতএব, সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তু-ভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তুকে লাভ করিতে হইবে। শুলের দ্বারা সে শুক্ষ-স্তুভাব কদাচ অধিগম্য নহে। অন্তর্নিহিত সংস্কৃতিময় সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তুভাবে মিলিত হইয়া, সেই সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তুর সহিত সংস্কৃত-সাপন করিতে সমর্থ হয়। বিশুদ্ধা ভক্তি, সেই শুক্ষমস্তুভাবের জনয়িত্বী,—হৃদয়ের সংস্কৃতিনিচয়কে তস্তাবে ভাবিত ও তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি-ভাবের উদ্দেশ্য—আরু তদর্থে যজ্ঞাভূতি প্রদান—বেদে শুসংস্কৃত সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশ্যে সোম দান—সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তু-মূলক বিশুদ্ধা ভক্তি—যজ্ঞভাগের সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তু অংশ সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তুর সহিত আমাদের সূক্ষ্ম শুক্ষমস্তুভাবের সম্মিলন।

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃ ফঁ # ফঁ —

ইন্দ্ৰমিদ্বাৰাথিনো বৃহদিন্দ্ৰমকেভিৱৰ্কণঃ ।

ইন্দ্ৰঃ বাণীৱনূষত ॥

• • •

বেদে নানা দেবতার উপাসনার কথা আছে। শীর্ষোক্ত মন্ত্রে তাহারই অর্থ অনুধাবন করা যায়। অন্ত্রে ইন্দ্ৰদেবকে লক্ষ্য কৱিয়া বলা হইয়াছে,—
‘দামগায়ী উদগাতৃগণ সাময়ন্ত্রে যে গান করেন, সে তো তোমারই স্তুতিগান।
খথেনৌষ হোতৃগণের উচ্চারিত খণ্ডমন্ত্রসমূহ—সে তো তোমারই স্তুতি !
অধৰ্ম্মগণের যে যজুর্মুক্তি—সে সকল তো তোমাকেই লক্ষ্য কৱিয়া উচ্চারিত
হয় ! এক কথায়, অয়ী (বেদ) তোমারই স্তুতিগানে বিনিযুক্ত আছে।’
এখন বুঁৰিয়া দেখুন,—কে দে ইন্দ্ৰদেব ?—কাহার মে উপাসনা ?

• • •

নাম দেখিয়া বিচঞ্চল হও কেন ? তিনি যে অনন্ত ! তাহার যে অনন্ত
নাম ! ইন্দ্ৰ তাহার মেই অনন্ত নামের একটী নাম মাত্র। যেমন তাহার
নামের অন্ত নাই, তেমনই তাহার কর্মেরও অন্ত নাই। অনন্তকর্ম্ম

বলিয়াই অনন্ত-ক্রম-গুণে তাহাকে বিজুলিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি ক্রমে, প্রতি ভাবে, তাই তাহাকে উন্নাসিত দেখি। যাহারা ইন্দ্র নামে তাহার উপাসনা করেন, তাহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উন্নত বলিয়া ঘোষণা করেন ('ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষে ঈয়তে' অর্থাৎ 'ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুক্রমে উৎপন্ন হন'); যাহারা বিষ্ণু, হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ববশ্রেণীর বলিয়া মান্য করেন, তাহারা তাহাদিগকেই সর্বকারণ-কারণ-ক্রমে ঘোষণা করিয়া থাকেন। যাহারা বুঝিতে পারেন না, তাহারাই দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি হন। যাহাদিগের বোধ-শক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাহারা শ্঵িরন্তে শ্বিরচিত্তে ভগবানের এই অনন্ত মহিমা দর্শন করেন।

* * *

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য মায়ারী বিভিন্নক্রমে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একক্রম, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে একক্রম, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একক্রম। আনন্দৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে উহা অনিব্যবচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে জগৎ-সমূহে এই ত্রিবিধ ভাব উন্নাসিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শাস্ত্রোচ্চিৎ (পঞ্চদশী); যথা,—

“তুচ্ছানিব্যবচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যৰ্মো ত্রিধা।

জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বেদৈঃ শ্রোতর্যোচ্চিক লৌকিকঃ ॥”

পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসমূহকেই যখন এতাদৃশ বিকৃক্ষমত ভাবের অধ্যাপন হয়; তখন যিনি অবাঙ্গনসোগোচর, তাহার সমূহে—তাহার প্রাপ্তি সমূহে—যে বহু মতবাদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশচর্য কি?

* * *

উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিম; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্ৰহণ আবশ্যিক হয়। ইহাই অধিকাৰ-বাদ। আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যে কঠোৱ-কঠিন-ভাবে অধিকাৰী-অনধিকাৰীৰ স্তৱ-পৰ্যায় নিৰ্দেশ কৰিয়া গিয়াছেন, তাহার কাৰণ, তাহাদিগের পক্ষ-পাতিহ বা একদেশবৰ্ণিতা নহে। সে কেবল জ্ঞান-বৃদ্ধিৰ সঙ্গে সঙ্গে গভীৰ বিষয়ে অভিনিবেশ-পক্ষে উপদেশ-দান উদ্দেশ্য মাত্ৰ। এই দেখুন নাকেন,—আমাদিগের ষড়দৰ্শন! সকল দৰ্শনেৱই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখ-

নাশ—অনাবিল স্থৰ্ধসাধন ; অথচ, পরিগৃহীত পছা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী, বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক—শান্তের ইহাই উদ্দেশ্য। শুভ্রি সেই কথাই কহিয়াছেন,—

“যথা নন্দঃ স্তৰ্যমানাঃ সমুজ্জেহস্তঃ গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্মারূপাদবিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমূল্পতি দিব্যম ॥”

—মুণ্ডকোপনিষৎ।

বরা,—

“অমির্বৈথেকে। ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্থা সর্বভূতাস্ত্রাঞ্চা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥”

—কঠোপনিষৎ।

নদী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে সাগরাভিংশুথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সে যখন সাগরে গিয়া মিশিয়া যায়, তখন তাহার নাম-রূপ সমস্ত লোপ পায়। মচ্ছিদানন্দ-সাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্তনদী সেইরূপ নামরূপ-বিমুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়। মানুষের সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নাম-রূপে বিমুক্ত হইয়া, মানুষ, সেই পরাংপর পরমেশ্বরেই সীন হউক। এইরূপ, সামগানকারী উদগাত্রগণ যে ইন্দ্রের গুণগান করেন, অথবা যজুর্বেদীয় অধ্যযুর্যগণ যে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অথবা যজুর্বেদীয় অধিগ্রাম করিয়া থাকেন ; তিনি সেই এক—তিনি সেই অভিন্ন। এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবেই তাঁহাতে মিলিতে হইবে, এই রূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। তাঁহাতে ভেদভাব—সে কেবল মানুষের আন্তিমাত্র।

ভগবানের অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি তাঁহার এক এক নামের বা এক এক রূপের পরিচয় মাত্র। তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলক্ষি করিতে পারিলে, নাম-রূপের সকল বিতঙ্গ বিলুপ্ত হয়। বেদে বহু দেবদেবীর নাম-রূপের অধ্যাস দেখিয়া বিভ্রাস্ত হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহার এক এক বিভূতি, এক এক নাম-রূপে প্রকাশমান। তিনি সেই অভিত্তীয় অভিন্ন একই আছেন।

জ্ঞান-বেদ !

— ১০৬ —

পরেহি বিঅমস্তুতমিত্রং পৃষ্ঠাবিপশ্চিতম্ ।
 - - - - -
 যন্তে সাধিষ্য আবরম্ভ ॥

শাস্ত্রে উক্তির নথটা লক্ষণ উল্লিখিত আছে ;—শ্রবণ, কৌর্তন, শ্মরণ,
 অর্চন, বশন ইত্যাদি । তদ্বাধ্যে আজ্ঞ-নিবেদন অন্যতম ।

‘শ্রবণং কৌর্তনং বিক্ষেণঃ শ্মরণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বশনং দাস্তং সখ্যমাজ্জনিবেদনং ॥’

এখানে সেই আজ্ঞ-নিবেদনের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি ।
 আজ্ঞ-নিবেদন যে শ্রেষ্ঠসাধক, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন ।

* . *

আজ্ঞ-নিবেদনে শ্রেষ্ঠোলাত্মের মাহাত্ম্য-কথা শ্রীমদ্বাগবতে এইরূপ
 পরিব্যক্ত আছে । যথা,—“মর্ত্যে যদা ত্যজসমস্তকর্ষা নিবেদিতাজ্ঞা
 বিচিকীর্ষিতো মে । তদাহ্যতত্ত্বং প্রতিপত্তমানো ময়াজ্ঞাত্মায় চ কল্পতে বৈ ॥”
 অর্থাৎ—‘হে উক্তব, তোমাকে সার বলিতেছি । সংসারী জীব যখন সর্ব-
 কর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আমাকে আজ্ঞনিবেদন করিতে সমর্থ
 হইবে, তখনই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে । প্রতি পদে যদি তাহারা
 সেই অমৃতত্ব লাভের প্রয়াস পায়, তাহা হইলেই তাহারা আমার মত
 হইবার উপরোগী হইতে পারে । ফলে, আমাতে আজ্ঞ-সমর্পণ করিয়া

তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকে । তাহাদের ধারাই আমার কার্য্য সন্ম্পদ হয় । তখন আমার সহিত তাহাদের কোনও অতঙ্কতা থাকে না, অর্থাৎ আজ্ঞায় আজ্ঞ-সম্মিলন ঘটে ।

* * *

‘দ্বিত্যবালকগণের প্রতি প্রহলাদের উপদেশে আজ্ঞ-নিবেদন মাহাজ্ঞ্য সম্যক্ পরিব্যক্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাই । যথা,—“ধর্মার্থকাম ইতি যোহভিহিতুন্নিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দৌর্মো বিবিধা চ বার্তা । মন্ত্রে তদেতদধিলং নিগমস্ত সত্যং স্বাজ্ঞাপণং স্বমুহুদঃ পরমস্ত পুংসঃ ॥” অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে প্রহলাদ বুঝাইতেছেন,—‘অনুর্যামী পরম স্বহৃৎ পুরুষোত্তমে যথন জীব আজ্ঞসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার মায়া-বন্ধন টুটিয়া যায় ।’ ভগবান् বলিয়াছেন,—“সর্বং ধর্মং পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ত্রজ ।” সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আশ্রয় কর—আমাতেই আজ্ঞসমর্পণ কর । আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব; অর্থাৎ, আমাতে আজ্ঞসমর্পণ করিলে তোমার জন্মগতি রোধ হইবে ।

* * *

সকল শাস্ত্রেই ভক্তির মাহাজ্ঞ্য পরিকীর্তিত । একমাত্র ভক্তি-প্রভাবেই স্বরূপি সংঘয় হয়—ভগবানের পরম প্রসাদ লাভ করা যায় । একমাত্র ঐকাণ্ডিকী ভক্তি ভিন্ন—একমাত্র আজ্ঞনিবেদন ভিন্ন, কোনও অমুষ্ঠানই মানুষকে সর্বতোভাবে পরম পদে পৌছাইয়া দিতে পারে না । বিশ্বরূপ-দর্শনে বিমুক্ত চকিত ভীত ত্রস্ত অর্জুনকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

“ভক্ত্যা স্বনন্দয়া শক্য অহমেবশিখেহর্জ্জন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং পরম্পর ॥”

ঐকাণ্ডিকী ভক্তি জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায় । যতক্ষণ না অনন্যা-ভক্তির সংশ্রার হয়, ততক্ষণ কেহই তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না । স্বরূপ-তত্ত্ব না জানিতে পারিলে, কেহই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না ।

* * *

এই অনন্যা ভক্তি কিরণে লাভ হয়? যথন ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূল্য হইয়া সকল কর্ম ভগবানে ঘন্ত হইবে, তখনই অনন্যা ভক্তি আসিবে—তখনই ভক্ত আজ্ঞ-নিবেদন করিতে সমর্থ হইবে । তখন সাধক কাম-

ମନୋବାକ୍ୟ ସାହା କିଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେନ, ସକଳଇ ଭଗବାନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହିଁବେ । ତଥନ, ମେହି ଭାବ ଆସିବେ, ମେହି ଭାବେ ପ୍ରାଣମନ ମାତୋ-
ଯାରା ହିଁବେ,—ତଥନ ମେହି ଭାବେ ତଞ୍ଚୟତା ଆସିବେ,—ଯେ ଭାବେ ଭକ୍ତ ସାଧକ—
“କାଯେନ ସାଚା ମନ୍ମେଣ୍ଡିଯୈର୍ବା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଜ୍ଞନା ବାନୁମୃତଃ ସ୍ଵଭାବାଂ । କରୋତି ଯେ
ତେ ସକଳଃ ପରୈଷ୍ମେ ନାରାୟଣୀୟେତି ସର୍ପଯେଇ ତେ ॥”—ନାରାୟଣକେ ସକଳ
କର୍ମ ସର୍ପଣ କରିବେନ । ତଥନ ଭକ୍ତ ସାଧକ ସାହା କିଛୁ କରିବେନ, ସକଳଇ
ଭଗବଦୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଯୋଜିତ ହିଁବେ । ତଥନ ତୀହାର ପ୍ରାର୍ଥନାଇ ହିଁବେ,—
“ପ୍ରାତରତ୍ଥାୟ ସାଯାହଂ ସାଯାହାଂ ପ୍ରାତରତ୍ତତଃ । ଯେ କରୋମି ଜଗମାତସ୍-
ଦେବ ତବ ପୃଜନମ ॥” ତଥନ ତୀହାର ଏକମାତ୍ର କାମନାଇ ହିଁବେ,—

“ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ବା ପାଦରତାଂ ପିନଷ୍ଟୁ ମାମଦ୍ୱାରାମର୍ମହତାଂ କରୋତୁ ବା ।

ଯଥା ତଥା ବା ବିଦ୍ଧାତ୍ୱ ଲଙ୍ଘଟୋ ମେତ୍ରାଣନାଥସ୍ତୁ ମ ଏବ ନାପରଃ ॥”

‘ଚରଣ ଧରିଯା ରହିଲାମ । କୃପା କରିଯା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିତେ ହୟ, ଆଲିଙ୍ଗନ
କର ; ରାଗାସ୍ତିତ ହିଁଯା ପଦଦଳିତ କରିତେ ହୟ, ପଦଦଳନ କର ; ଦେଖା ଦିତେ
ହୟ, ଦେଖା ଦେଓ ; ଅଥବା ଅଦର୍ଶନେ ମର୍ମାହତ କରିତେ ହୟ, ମର୍ମାହତ କର ।’
ଅର୍ଥାଂ, ଯୀହାତେ ତୀହାର ସୁଖ, ତାହାଇ ଆମାର ସୁଖ୍ସୌଭାଗ୍ୟ ; ତିନି ଆମାର
ପ୍ରାଣନାଥ ପ୍ରାଣପତି ; ତିନି ଆମାର ପର ନହେନ । ଏହି ଭାବଇ ଅଭେଦ-ଭାବ ;
ଏହି ଭାବଇ — ଆଜ୍ଞା-ନିବେଦନ । ଏହି ଭାବେଇ ପରାଗତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୟ,—
ଏହି ଭାବେଇ ଆଜ୍ଞାଯ ଆଜ୍ଞା-ସମ୍ପଲନ ସଟିଯା ଥାକେ । ମନ୍ତ୍ରେ ଏହି ଆଜ୍ଞା-
ନିବେଦନେର ଉଦ୍ବୋଧନାଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଛେ । ବଲା ହଇଯାଛେ,—“ହେ ମନ !
ଯିନି ସକଳ ବନ୍ଧୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମେହି ଦେବତାର ନିକଟ ଆଜ୍ଞା-ନିବେଦନ କର ।
ତାହାତେଇ ତୋମାର ସର୍ବବିଧ ଶ୍ରେୟଃ ସାଧିତ ହିଁବେ ।’

জ্ঞান-বৈদ |

—ঃ ফ * ফঃ ——

মহে অর্ণঃ মরস্বতৌ প্ৰ চেতৱতি কেতুনা ।

ধিরো বিশ্বা বি রাজ্যতি ॥

অৱপেৱ অনন্ত রূপ ধাৰণা হয় না বলিয়াই অৱপেৱ রূপেৱ কল্পনা কৱা
হয়। অগুণেৱ (নিগুণেৱ) অনন্ত গুণ বলিয়া, নিগুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে
পাই। আমৱা মনে কৱি, তাঁহাৱ অনন্ত রূপ, তাই তাঁহাকে অ-রূপ বলা
হয়। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নিগুণ, আমাদেৱ চিত্তে সে
সে ভাব কথনও জাগৱক হয় না। তিনি গুণেৱ অতীত, তাঁহাতে গুণেৱ
শেষ নাই, অথবা তাঁহাৱ অনন্ত গুণ,—এই জন্মতু তাঁহাৱ নিগুণ (অনন্ত
গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও, তাঁহাৱ অনন্ত রূপও অনন্ত গুণ
জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপ-বিশেষেৱ বা গুণ-বিশেষেৱ আৱোপ কৱি, সে
কেবল আমাদেৱ আত্ম-তৃপ্তিৰ জন্ম। আমাদেৱ সান্ত-হৃদয়ে অনন্তেৱ
ধাৰণা অতি আয়াসমাধ্য মনে কৱি বলিয়াই আমৱা আবশ্যক অনুসারে
অনন্তে রূপ-গুণেৱ আৱোপ কৱি। লক্ষ্য—এই সান্তেৱ মধ্য দিয়া—এই
রূপেৱ মধ্য দিয়া—যদি মেই অনন্তে বা মেই অৱপে পৌছিতে পাৰি।

• • *

কিন্তু সময় সময় হিতে বিপরীত কল সঞ্চাটিত হয়। অন্তে কলপের আরোপ, নির্গুণে গুণের দ্বোতনা, সর্ব-ব্যাপকের স্থান-বিশেষে অবস্থিতির কলনা,—অনেক সময় অনর্থের সূচনা করে। অনেক সময় মহাপুরুষগণ তাই ভগবানের কল-গুণ-অবস্থানের নির্দেশ করিয়া তৃপ্ত হন না। তিনি যে কল-বিবর্জিত, অথচ ধ্যানে তাঁহার কল-কলনা করি; তিনি যে অধিলগুরু অনিব্রিচনীয়, অথচ স্তবে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার অনিব্রিচনীয়তা দূর করি; তিনি যে সর্বব্যাপী, অথচ তীর্থ্যাত্মাদির দ্বারা তীর্থ-বিশেষে তাঁহার অবস্থিতি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব নষ্ট করি। এ একটা মানুষের প্রকৃতি। সাধকের হৃদয়ে অনেকে সময় এজন্ত একটা অনুত্তাপ আসে। তাঁহাকে কল-গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও, সাধক তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিতেছেন,—

“কলঃ কলবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতঃ

স্তুত্যানিব্রিচনীয়তাখিলগুরোদুরীকৃতা যশ্ময়া।

ব্যাপিত্বং নিরাকৃতঃ ভগবতো যত্তীর্থ্যাত্মাদিনা

ক্ষন্তব্যং জগদীশ ! তদ্বিকলতাদোষত্বং মংকৃতম্ ॥”

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—“যেন এই কলপের মধ্য দিয়াই তোমার পাই, যেন এই স্তুতির মধ্যেই—ধ্যানের নিগড়েই তোমাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হই! যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গভীতেই তোমায় আবদ্ধ দেখি।” তাই তাঁহারা বলেন,—

“থং বাযুমগ্নিং সলিলং মহীং জ্যোতীংষি সস্তানি দিশে ক্ষমাদীন্ম।

সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতঃ প্রণমেদনন্তঃ ॥”

‘কি আকাশ, কি অনল, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী, কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিক্ষমূহ, কি তরু-লতা-ফুলকল, কি সরিৎ, কি স্তুত্র, কি কলন,—ভূমগুলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্তমনে প্রণাম করিবে।’

* * *

ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করে,—এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করে; সাধক এই ভাবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে,—এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হয়; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে মুক্ত হইয়া থাকে;—এই

ত্বাবেই তাঁহাতে শৃঙ্খচিত্ত রহে। প্রণয় সকলেই ; কেবল মনে থাকিলেই হয় যে, সে সকলই তাঁহার অঙ্গীভূত। আমরা যে মুর্তিতেই তাঁহার পূজা করি, আমরা যে ধ্যানেই তাঁহাকে ধারণা করি, আমরা যে স্মানেই তাঁহার অবস্থিতি কল্পনা করি, সকলই তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিহিত হইতেছে—মনে রাখিলেই শ্রেষ্ঠোলাভ অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া আসে। এই কারণেই অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভূতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ ; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা ; এই কারণেই জগন্মাতা জগদ্গুরু-কালী-ছুর্গী-তারা মহাবিষ্ট। প্রভূতির অর্চনা, এই কারণেই অগণ্য অমংখ্য তেজিশ কোটি দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্তন। শীর্ষোভূত মন্ত্রে যে দেবী সরস্বতীর মহিমা প্রথ্যাত হইয়াছে, তাহারও মর্ম এই।

' * . '

বুঝিয়া দেখুন দেখি,—কে সে সরস্বতী ? মনে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে ! বলা হইয়াছে,—‘দেবী সরস্বতী কর্মসূরা (প্রজ্ঞানের দ্বারা) মহঃ অর্ণের (বিশ্বব্যাপী অপের) বিষয় জ্ঞাপন করেন ; অর্থাৎ, তিনি যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, তাঁহার কর্ম দ্বারাই তাহা জানিতে পারি ; তিনি বিশ্বের সকল জ্ঞানের উম্মেশ করিয়াছেন। তাব এই যে, কর্মের দ্বারাই দেবতত্ত্ব অবগত হই ; তাহাতেই প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়।’ আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়া, অনন্তকে সান্ত রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপ-বিবর্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে আবদ্ধ, সর্বব্যাপীকে স্থান-বিশেষে অবস্থিতির পরিকল্পনা—এই কারণেই বিহিত হয়।

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃঃ—

এবা । । ।
হন্ত সুন্তা বিরপ্শী গোমতৌ মহৈ ।
— ।
— ।
— ।

পক্ষা শার্থা ন দাশ্যে ॥
— ।
— ।
— ।
• • *

এই মন্ত্র ভগবত্তাকের অর্থাত্ মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছে।
ভগবত্তুখবিনিঃস্ত যে বাক্য বা মন্ত্র, তাহার শক্তি অপরিসীম ! সে বাক্য
'সুন্ত' অর্থাত্ প্রিয় অথচ সত্য। যাহা সত্য, তাহা সত্যেরই সহিত
সম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং সত্য যে তাহার প্রিয়, সত্য যে তাহার অঙ্গীভূত,
অর্থাত্ সত্য ধে তাহা, হইতে অভিষ্ঠ, তাহাতে আর সংশয় কি আছে ?
সেই জন্মই শাস্ত্রে 'মন্ত্র-অঙ্গ' বাণী বিঘোষিত দেখি ।

• • *

মন্ত্রও যে বস্তু, অঙ্গও সেই বস্তু। কেন-না, মন্ত্রধারাই অঙ্গকে
প্রাপ্ত হওয়া যায়, আবার অঙ্গ হইতেই মন্ত্র নিঃস্ত হয়। আমার নাম
কি—আমি যদি তোমায় বলিয়া দিই, আর তুমি যদি আমার সেই নামে
আমায় আহ্বান কর, আমায় নিশ্চয়ই তোমার আহ্বানে কণ্পাত
করিতে হইবে। আমাকে আহ্বান-পক্ষে আমার নাম-ক্লপ সঙ্গেত

যেমন কার্য্যকরী হয়, ভগবানের সাম্বিধ্য-লাভ-পক্ষেও তাহার মন্ত্র-রূপ
সঙ্গেত সেইরূপ সুফল প্রদান করে।

* * *

“অস্তি সুন্ততা” পদব্যৱে তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বা তাহা হইতে
বিনিঃস্থিত সত্যস্বরূপ বাক্যই বুঝাইতেছে। তার পর, সে ‘বাক্’ (বাক্য)
কেমন, বিভিন্ন বিশেষণ তাহা ব্যক্ত হইতেছে। উহা ‘বিরপ্তী’—বিবিধ
উপচারবতী বা বৈচিত্র্যবিশিষ্টা ; ‘মহী’ অর্থাৎ মহতী শ্রেষ্ঠা সুস্পষ্টবাদিনী
বা অর্চনীয়া ; ‘এবং গোমতী’ অর্থাৎ জ্ঞানদায়িনী। এক একটি বিশেষণই
সে বাণীর সার্থকতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

* * *

স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিয়া মানুষ যথন সেই বৃক্ষের শাখায় স্বপক
ফলসমূহ দোহুল্যমান দেখিতে পায়, তখন তাহার আর আনন্দের পরিসীমা
থাকে না। এ উপমায় কি সরল সুন্দর ভাবেই নিগৃঢ় তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত
হইয়াছে ! . সেই পবিত্র বিচিত্র জ্ঞানপ্রদ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, যাজিক যথন
সে মন্ত্র সার্থক প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তখন তাহার প্রাণে কি অমুপম
আনন্দেরই সংঘার হয় ! অন্যপক্ষে, “পক্ষা শাখা ন” এই উপমায় আর
এক মহৎ ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। ভগবানের মুখনিঃস্থিত বাক্যে বা
মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক যথন তম্ভয়ত্ব লাভ করেন, তখন তাহার
সেই ভাব দেখিয়া ভগবানও পরম আনন্দিত হন। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষে
স্বপক ফল দোহুল্যমান দেখিলে, বৃক্ষ রোপণ করিয়া রোপণকারীর যে
আনন্দ, আনন্দসময়েও তখন সেই আনন্দের উৎস উচ্ছৱিত হয়—মর্নে
করিতে পারি। তাহাতে, আনন্দ-বিভোর সাধক, সর্বানন্দসময়ের সংশ্রব-
লাভে সমর্থ হইয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হন।

* * *

মন্ত্র বলিতেছেন,—‘ভগবৎ-বাক্য-রূপ সত্যমন্ত্র প্রহণ কর। তদনু-
সারে কর্ম করিতে প্রযুক্ত হও ; হৃদয়-বৃক্ষে জ্ঞান-রূপ পক্ষফল স্তরে স্তরে
সম্ভিত দেখিবে,—চিদানন্দে মগ্ন হইবে।’ ফলতঃ, বিধিপূর্বক বেদগন্ত্রের
অনুধ্যানে যে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, এই মন্ত্র তাহাই ঘোতনা করিতেছে।

জ্ঞান-বেদ ।

— ১০ —

অহং মো অশ্মি যঃ পুরা স্বতে বদামি কানি চিৎ ।

তৎ মা ব্যস্ত্যাধো ও বুকো ন তৃষ্ণজৎ মৃগং

বিজ্ঞৎ মে অশ্ম রোদসৌ ॥

বিভাস্ত আমরা ! আমাদিগের সকল কর্ষেই বিভাস্তি ! বিভাস্তির ঘূর্ণবর্তে পড়িয়া, আমরা সদসৎ গ্যায়-অন্যায় বিবেচনা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছি ; সার সত্যের অনুসরণে আমাদিগের আর প্রবৃত্তি জন্মে না । পিপাসার্তি মৃগ যেমন জল-ভ্রমে মরীচিকায় মুক্ষ হয় ; আমরাও সেইরূপ, বিভাস্তির মোহে ভুলিয়া, ঐহিক স্বর্থের আশায় প্রলুক্ত হইয়া, মৃত্যুকে 'নিরস্তর' আলিঙ্গন করিতেছি ।

কিন্তু এ বিভ্রম কোথা হইতে আসিল ? কোন্ কর্ষের ফলে আমরা এমন বিভ্রংশ্বস্ত হইয়া পড়িলাম ? এ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা আমাদিগের আর্দ্দী নাই । আমরা কেবল বাসনার শ্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি । বাসনা-নদীর ধরন্ত্রোত আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যাইতেছে, আমরা সেই দিকেই প্রধাবিত হইতেছি । আমরা স্বর্থের জন্য অশ্বির ; স্বর্থের আশার

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। তৃষ্ণিত মুগ যেমন জলাশয়ের উদ্দেশে ধাবমান হইয়া পথিমধ্যে ব্যাক্তি কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয় ; আমরা ও সেইরূপ ঐহিক স্থানের লালসায় প্রচুর হইয়া রিপুকবলগত হইতেছি। কিন্তু ঐহিক স্থান যে বিদ্যাতের ন্যায় ক্ষণপ্রতি, ঐহিক স্থানের পরিণাম যে চির অশাস্তি, আমরা সে কথা একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখি না। রিপুর প্রভাবে আমরা কর্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলি। রিপুকে শাসন করিবার পরিবর্তে আমরাই রিপুগণ কর্তৃক শাসিত হই।

* * *

একদিকে এই বিভ্রাস্তি, অন্যদিকে আবার সকল বিষয়েই আমাদিগের পল্লবগ্রাহিতা ! এই দুই কারণেই আমরা ঘোর অঙ্ককারে নিপত্তি হইয়া আছি। শীর্ষোক্ত বেদ-মন্ত্র এই তত্ত্বই আমাদিগকে অবগত করাইতেছেন। মন্ত্রটিতে আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোবোধনা ও প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে—‘যদি ও আমি ত্রক্ষের অঙ্গীভূত, তথাপি তৃক্ষামূলক কর্ম আমার দুঃখের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। হে. দেবগণ ! আমার দুঃখমূলক সেই তৃক্ষাকে আপনারা দূর করিয়া দিউন। সত্য বটে, আমি সেই অনাদি অবিতীয় বিশ্বস্তা মহান् পুরুষ পরমত্রক্ষের অংশ ; কিন্তু আমার অজ্ঞানতা এবং তৃক্ষামূলক কর্মই আমাকে বিভ্রাস্ত করিয়া রাখিয়াছে,—আমাকে তাঁহা হইতে দূরে ফেলিয়াছে। পরস্ত যে কর্ম ভগবৎ-প্রাণির মূল, তাহাতে আমি বিরত আছি।’

* * *

উৎপত্তি-স্থান উৎকৃষ্ট হইলেও, উৎপন্ন বস্তু তত্ত্বাতীয় হইলেও, কল্প-সংযোগে তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে। দুঃখ—অমৃততুল্য। কিন্তু অন্নসংযোগে

• মন্ত্রের মৰ্ম্মান্বিগী-ব্যাখ্যা আমাদিগের “ঝঁপ্পেন-সংক্ষিপ্তি” দেখুন। তাহার ব্যাখ্যাম,—“সেই ব্রহ্ম (দেবতা) নিত্যকাল বিশুদ্ধ সংকর্ষে বিচ্ছান আছেন ; প্রার্থনাকারী আমিও সেই ব্রহ্ম (দেবতা) হই ; কিন্তু কোনু কর্মসকলকে নির্দেশ করিব—বে কর্মকলে তামুশ ব্রহ্ম অঙ্গীভূত আমাকে, ব্যাজ যেমন পিপাসিত মুগকে পথে পাইয়া আক্রমণ করে সেই-ক্রম, দুঃখবিষহ বিদ্যারূপ করিতেছে। (ভাব এই যে,—যদিও আমি ত্রক্ষের অঙ্গীভূত, কিন্তু তৃক্ষামূলক কর্ম আমার দুঃখহত্তুল হইয়াছে) ; হে হ্যালোক-ভূলোক-সমষ্টীর সকল দেবগণ ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করন ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ ! আমার দুঃখমূলক তৃক্ষা দূর হউ ন ।) ”।

বিকৃত হয় ;—গোরোচনা সংশ্লিষ্ট হইলে নষ্ট হইয়া যায়। আত্মফল উপাদেয় বটে ; কিন্তু কীট-প্রবেশে অথবা পচন-সংযোগে, তাহা একেবারে উপাদেয়-অন্ত অব্যবহার্য হয়। আমাদিগের বর্তমান অবস্থা-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। আমরা সত্ত্ব-স্বরূপ সেই ব্রহ্মের অংশ বটে; কিন্তু কর্মদোষে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছি ;—তাহা হইতে দূরে আসিয়া দাঢ়াইয়াছি। কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হওয়ায়, অপকর্মের পর অপকর্মে প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করায়, এখন আর আমাদিগের ব্রহ্ম-সম্বন্ধের পরিচয় দিবার কিছুই নাই। এ অবস্থায় এখন আর, দেবতার করণ-প্রার্থনা ভিন্ন, দেবতার কৃপা-প্রাপ্তি ভিন্ন, দুর্যোগে দেবতাবের উপরে ভিন্ন, গত্যস্তর দেখা যায় না।

• • •

এইরূপ আত্মোদ্বোধ হওয়ায়, বেদ-মন্ত্রে তাই যেন প্রার্থনা জ্ঞান-হইতেছে ;—‘হে দেবগণ ! আমার কর্মপক্ষত্বিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিউন ;—রিপুগণের কবল হইতে আমাকে মুক্ত করুন ; আমি যে সেই পরব্রহ্মেরই অংশ, আমি যে সেই পূর্ণমঙ্গলময়েরই অঙ্গীভূত, এ কথা আমি যেন জুলিয়া না যাই ; পরম্পরা কি প্রকারে তাহাতে লৌন হইতে পারি, কি প্রকারে স্বরূপ হইয়া স্বরূপে আজ্ঞালীন করিতে সমর্থ হই,—এ জ্ঞান যেন আমাতে উপজিত হয়।’

• •

এ পক্ষে প্রথান প্রয়োজন—আত্মত্ব-অনুস্মরণ। কে আমি ? কোথা হইতে আসিয়াছি ? কোথায়ই বা চলিয়াছি ? এই চিন্তা সর্বদা মানুষের মনে জাগরুক হউক। মন্ত্র সেই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে—জাগরণই—পূর্বস্মৃতিত অনুধ্যানে তৎপথানুবর্ত্তী হওয়ার প্রয়ামই—উপত্যির সোপান। যদি উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে চাও, আজ্ঞাবিশ্বাসি পরিহার কর ; মনে প্রাণে ধারণ কর,—“অহং সো অংশি।”

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ # ঃঃ—

১২

৩১ ৩২

৩ ১২

বন্যাম, ইস্রামি মে পিতুরুত ভাতুরভূঞ্জতঃ ।

৩ ১ ১২

৩ ১ ২

৩ ২ ৩ ১ ২

মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বনো বস্তুত্বনাম রাধনে ॥

• • •

'কেবল ঈশ্বর এই বিশ্঵পতি যিনি ।

সকল সময়ে বক্ষু সহনের তিনি ।'

ঈশ্বরই জগতের একমাত্র প্রকৃত রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা । তিনিই জগতের পিতামাতা ; তাহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; তাহারই কৃপায় জগৎ পরিচালিত হইতেছে । তিনি মাতার মাতা, পিতার পিতা, জাগতিক সকল বস্তুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম্ বক্ষু । তাহার অপার প্রেমের কণামাত্র পাইয়া মানুষ প্রেমিক হয়, তাহার শক্তির বিদ্যুমাত্রের অধিকারী হইতে পারিলে মানুষ অমাধ্য সাধন করিতে পারে ।

• • •

পার্থির মাতাপিতা মানুষকে জন্ম দিয়া লালন পালন করিয়াই ক্ষম্ত হয়েন ; তাহাদের ইহার অধিক কিছু করিবার শক্তি নাই । কিন্তু জগতের পিতা যিনি, সমস্ত বিশ্ব বাহার দ্বারা পরিচালিত হয়, কেবলমাত্র তিনিই মানুষকে তাহার চরম লক্ষ্যে পেঁচিবার উপযোগী শক্তি প্রদান

করিতে পারেন। মানুষ, জাতাপিতার বন্ধুবাঙ্কবের স্বেহ-ভালবাসা পাইয়া, তাহারই প্রেমের ছায়া তাগতে দেখিতে পায় সত্য; কিন্তু এই জাগতিক প্রেম তাহাকে তাহার চরম লক্ষ্য পৌছাইয়া দিতে পারে না। বরং মানুষ অস্ত্রান্তা ও মোহন্দারা আবদ্ধ হইয়া আপনার চরম লক্ষ্য ভুলিয়া যায়—তাহার আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়। কেবলমাত্র বিশ্বনিয়স্তা ভগবানই মানুষকে তাহার গন্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন,—মেই পথে “চলিবার শক্তি” দিতে পারেন।

* * *

তত্ত্বদর্শী সাধক, মায়ার সংসার গোহের আগার পরিত্যাগ করিয়া, মেই পরম-ধনের সন্ধানে বাহির হইয়া যান। তাই রাজস্ত, পার্থিব সম্পৎ, পিতা-মাতার স্বেহ, প্রেময়ী পত্নী গোপার প্রেম—বুদ্ধদেবকে মুঝ করিতে পারে নাই। তিনি এমন ধনের, এগন প্রেমের সন্ধানে বাহির হইলেন,—যে ধন যে প্রেম মানুষকে প্রচুর স্বখ-শান্তি দিতে পারে;—যে প্রেম পাইলে বিশ্ব আপন হইয়া যায়। অনিত্য-সংসারের এই অনিত্য প্রেম, ধন-সম্পৎ মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, তত্ত্বদর্শীকে মুঝ করিতে পারে না। এই বন্ধুবাঙ্কবের বেড়াজাল হটতে মুক্ত হইয়া, তিনি এমন বন্ধুর—এমন আপনজনের সন্ধানে বাহির হয়েন, যে আপনজন অনন্তকাল ধরিয়া আপনার অনন্ত অফুরন্ত প্রেমামৃত মানুষকে পান করাইতেছেন। তিনি কি আর অন্যতে তৃপ্ত হন? “বিস্মৃতে কে তৃপ্ত হবে, সিঙ্গু যদি খিলে?”

* * *

কিন্তু, মেই আপনজনকে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নয়—যদি মেই অনন্ত প্রেমামৃত আপনি আসিয়া না ধরা দেন। মেই আপন-জনকে খুঁজিতে গিয়া সাধক তাহাকে সঙ্ঘোধন করিয়া কহিতেছেন,—

“আপন চিনা কঠিন ভবে,

আপন চিনবে যেদিন, বিশ্ব সেদিন, আপন হয়ে যাবে।

চিনিলে আপনজনা, হয়ে যেতে খাটী সোণা।

পেতে তার প্রেমের কণা—তেমে যেতে কবে!”

সে ত আর বিস্মু নয়, সে যে অপার সিঙ্গু! তাহার সঙ্গে কি পার্থিব পিতা-মাতার বা আতাবন্ধুর ভুলনা হয়? তাই বলা হইতেছে—‘বস্তাও ইঞ্জাপি

মে পিতুরূত ভাতুরভূঁশ্বতঃ ।' তাই, ইঙ্গিত করা হইয়াছে—‘মানুষ ! এমন
জনকে ভালবাস, এমন জনের উপর রক্ষা ও পালনের জন্য নির্ভর কর,
যিনি অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ।' সাধক গাহিতেছেন—
“মন ! ভালবাসতে যদি হয়, তারেই শুধু ভালবাস যে জন প্রেময় ।”

* * *

এমন প্রেময় দয়াময় যিনি, তাহার নিকটে মানুষ প্রার্থনা করিবে না ত
কাহার নিকটে করিবে ? তাই প্রার্থনা দেখিতে পাই,—‘ছদ্যথঃ বসো
বস্তুত্বনায় রাধিসে’। ‘ওগো জ্ঞানয়, ওগো প্রেময় ! তোমার করুণাধারা
আমাদিগের উপর বর্ধিত হউক । আমরা অজ্ঞান, আমাদিগকে জ্ঞান দাও—
যেন তোমার চরণে পৌছিবার উপায় জানিতে পারি । আমরা দুর্বল ;
আমাদিগকে এমন শক্তি দাও—যেন সকল বাধা-বিষ্ফুল দূর করিয়া তোমার
অভিমুখে চলিতে পারি । আমরা প্রেমহীন শুক্ষ হৃদয় ; প্রেম দাও প্রভু—
যেন তোমার প্রেম আস্থাদন করিতে পারি । প্রভো ! মাতৃ-রূপে তুমি
আমাদিগকে তোমার স্বেহশীতল-ক্ষেত্ৰে আশ্রয় দাও, পিতৃ-রূপে তুমি আমা-
দিগকে পালন কর—রক্ষা কর ; পাপ-সংশ্পর্শে আসিলে শামন কর ; ভাতৃ-
রূপে সখা-রূপে ঘোহ-বিভাস্ত আমাদিগকে হাত ধরিয়া লইয়া যাও . প্রভু ।

* * *

মন্ত্রটী খণ্ডে ও সামবেদে উভয়ত মুঠ হয় । আমাদিগের মর্মানুপালিণী ব্যাখ্যার
মূল্য এইরূপ পঞ্জগৃহীত হইয়াছে ;—

‘ইত্ত্ব’ (বলেক্ষণ্যাধিপতে হে দেব) ‘অভুঁতঃ’ (স্বাত্মানাপ্রাপ্তত্ব, সত্ত্বস্বৰূপিতত্ব
ইত্যৰ্থঃ) ‘মে’ (মম) ‘পিতুঃ’ (অনকান) ‘উত্ত’ (তথা) ‘ভাতুঃ’ (সহোদরান) ও ‘বস্তাং’
(অধিকতরমক্ষণাকাঙ্ক্ষী) ‘অগি’ (শব্দি) ; ‘বসো’ (বাসন্তিঃ স্তুত্যব্যাপ্তিঃ হে দেব)
ও ‘চ’ (তথা) ‘মে’ (মৰ্মায়) ‘মাতা’ (জননী) ‘সমা’ (সমানঃ স্বেহশীলঃ সন্তঃ) ‘বস্তুত্বনায়’
(আবাগহানপ্রাপ্তার, মোক্ষপ্রাপকার ইত্যৰ্থঃ) ‘রাধিসে’ (পরমার্থক্রপাত্র ধনার, পরাজ্ঞানার)
‘ছদ্যথঃ’ (মাং কৃপাং কুকু, মাং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছ ইত্যৰ্থঃ) ; সর্বেভ্যঃ লোকনাং অধিকতরঃ
মক্ষণাকাঙ্ক্ষী ভগবান् মাং কৃপাং বরোভু—ইতি প্রার্থনার্থাঃ তাৎ ॥

— • —

জ্ঞান-বেদ !

—ঃঃ * ঃঃ—

অক্ষিতোত্তিঃ সনেদিমং বাজ মিল্লঃ সহস্রিণং ।

যম্মনঃ বিশ্বানি পৌঁশ্টা ॥

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মৰ্ম্ম এই যে,—‘অথণ আশ্রয়দাতা (ক্ষয়রহিত ক্ষয়ণশীল) হে ইন্দ্রদেব ! সর্ববিধ যজ্ঞকর্ষে আমরা আপনার উদ্দেশে অম সম্পর্গ করিতেছি (আপনার নিকট ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাইতেছি) ; আপনি তাহা গ্রহণ করুন । প্রার্থনা,—আমরা যেন পৌরুষ-সামৰ্থ্য প্রাপ্ত হই ; অর্থাৎ, পুরুষার্থ-সাধন-ক্ষম প্রভৃত শক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হই ।’

এ পক্ষে, এ মুন্ত্র কামনা-মূলক । তবে এ কামনা—স্঵তন্ত্র কামনা । এ কামনা—পার্থিব ধনৈধর্যের কামনা নহে ; এ কামনা—পুত্রকলাত্মাদি-লাভের কামনা নহে ; এ কামনা—ভোগ-লালসা-মূলক নহে ; এ কামনা—বিত্ত-সম্পত্তির কামনা নহে ; এ কামনা—ঐহিকস্থৰ্থভোগ-লালসামূলক নহে । এ কামনায় সাংসারিক আবিলতা নাই ; এ কামনা—ভোগ-লালসায় কল্পিত নহে ; এ কামনায়—কলুষ-কলঙ্ক নাই । এ কামনার সহিত ভোগলিপ্তার, বিত্ত-সম্পত্তির বা ধনপুত্রাদির কোনই সংশ্লিষ্ট নাই । তবে এ কামনা—কিঙ্গপ কামনা ? এ কামনা—আস্ত্রায় আজ্ঞাসম্মিলনের কামনা ;

এ কামনা—পরমাত্মায় আজ্ঞালীন করিবার বাসনা; এ কামনা—পরাগতি মুক্তিলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা; এ কামনা—সেই অংশান কুশলের মধুপান জন্য মনোমধুকরের প্রবল তৃষ্ণা।

• • •

সকলেরই সক্ষয় সেই এক—অভিষ্ঠ। মানুষ যাহা কিছু করে, সকলেরই উদ্দেশ্য—সেই দুঃখনিরুত্তি, সেই শুধুমাত্র। কিন্তু কোথায়ও তাহার দুঃখের নিরুত্তি আছে কি? তাহার কামনা-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে, দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। নদীপ্রবাহ যেমন একটীর পর একটী, তাঁর পর একটী—অনবরত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে; মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একটীর পর একটী করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে; পুরাতনের পর নৃতন, নৃতনের পর আবার মৃতন—তাহার যেমন বিরাম দেখি না; সেইরূপ দুঃখের পর দুঃখ আসিয়া, কামনার পর কামনা আসিয়া, তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এক দুঃখের নিরুত্তি হইতে না হইতেই নৃতন দুঃখের মৃতন নিষ্পেষণে সে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। সংসারে যেমন দুঃখের অস্ত নাই; সংসারীর তেজনি দুঃখ-নিরুত্তির চেষ্টারও পরিসীমা দেখি না। কামনা-বাসনাই সকল দুঃখের মূলভূত, আশা-আকাঙ্ক্ষাই সকল দুঃখের আকর।

• • •

অনুভাবনাই দুঃখ। সেই দুঃখ-নিরুত্তির বিবিধ উপায় শান্তে বর্ণিত আছে। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ-নিরুত্তি-বিষয়ে প্রশংসিজ্ঞান হইলে, কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—“যথার্থ বলিতেছি, ‘আমি’ ও ‘আমার’ জ্ঞান যতক্ষণ তোমার থাকিবে, ততক্ষণ তুমি দুঃখ নিষ্পৃষ্ট হইতে পারিবে না। যখন তোমার ‘আমি’ ও ‘আমার’ জ্ঞান বিদূরিত হইবে, তখনই তুমি দুঃখ-মুক্ত হইতে পারিবে।” শুতরাং অহক্ষারই যে সকল দুঃখের হেতুভূত, তবিষয়ে সম্বেদ নাই। যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহার অস্তিত্বাব, তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়াই দুঃখ। সে দুঃখের নিরুত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা লাভ করা কিরণে হইতে পারে? তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনরাপি কহিলেন,—“যথার্থই,

‘আৰি’ ও ‘আমাৰ’ বলিয়া কোনও পদাৰ্থ নাই; আছে কেবল—একমাত্ৰ পৱাংপৱ শিব পৱমাজ্ঞা। সেই শান্তিময় আজ্ঞা হইতেই এই প্ৰতিভাসিক দৃশ্য বস্ত। কিন্তু এই দৃশ্যেৰ কোনও স্বৰূপ নাই, ইহা অলীক। অগৎ-নামক এই যে দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ফলে ইহা স্বৰ্বর্ণেৰ বলয়েৱ ঘ্যায়, শিবময় আজ্ঞা হইতে পৃথক কোনও বস্ত নহে। ইহাকে পৃথকৱৰ্ণনে না জ্ঞানাকেই সাধুগণ ইহার ক্ষয় বলিয়া থাকেন। ইহার ক্ষয় হইয়া গেলে একমাত্ৰ সত্য সেই পৱমত্ত্বক্ষেত্ৰ থাকেন। বিষ্ণুৰ অভ্যন্তৰগত মজ্জা, অভ্যন্তৰে যে বীজাদি উৎপাদন কৱে, সেই বীজাদি যেমন বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নহে; সেইৱৰ্ণ চিৎস্বৰূপ আজ্ঞা আপনাতে যে চিন্ত নামক ত্ৰিপুটী রচনা কৱেন, সেই ত্ৰিপুটী তাহা হইতে কিছুমাত্ৰ ভিন্ন নহে। স্তুলোকেৱ অন্তৰ্গত অনুষ্ঠীপাদি-বিভাগ যেমন স্তুলোক হইতে ভিন্ন নহে; সেইৱৰ্ণ আকাশেৰ অন্তৰ্গত পৃথিব্যাদি পদাৰ্থও, পৱমাজ্ঞা হইতে অণুমাত্ৰ পৃথক নহে। যেমন জল ও জলেৰ অন্তৰ্গত দ্রবত্ত, পৱম্পৱ অভিন্ন পদাৰ্থ; সেইৱৰ্ণ চিন্ময় ও চিন্ত একই পদাৰ্থ; জলে যেমন দ্রবত্ত ও তেজে যেমন আলোক বিশ্বগান থাকে, সেইৱৰ্ণ পৱত্রঙ্গেও চিন্তাব ও চিৰভাব দুই-ই আছে। দৃশ্য প্ৰকাশ কৱাই চিতিৰ কৰ্ম; সেই কুটন্ত চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য অমপ্রতীয়মান ঘন্ষেৱ ঘ্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাহা উৰ্দিত নহে। অতএব মনুষ্যেৰ নিজেৰ কোনও কৰ্ম বা কৰ্তৃত্ব নাই, ইহা হৰিয়।” শে কেবল বিভূম মাত্ৰ।

* * *

স্বতৱাং যতদিন অহঙ্কাৰ থাকিবে, যতদিন অহং-জ্ঞানেৰ তিরোভাব না হইবে, ততদিন দুঃখেৰ নিৰুত্তি নাই। কৃপমধ্যে সঞ্চাত হৱিৎ তৃণেৰ লাল-সায় ধাৰমান হইয়া হৱিৎ যেমন কৃপমধ্যে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তৃষ্ণাৰ অনুসৱণে অনুসৱণকাৰী মৃঢ় ব্যক্তি ও সেইৱৰ্ণ অক্ষতম নিৱয়কূপে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্ৰণা ভোগ কৱে। তৃষ্ণা বা বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা—অহঙ্কাৰেৱই নামান্তৰ। সেই অহঙ্কাৰেৰ ক্ষয় হইলেই সকল দুঃখেৰ অবসান হয়; তখনই শ্ৰেয়োলাভে—স্বৰ্যসাধনে সমৰ্থ হইতে পাৱা ঘ্যায়। শান্তি তাই বলিয়াছেন,—“অনহঙ্কাৰী কৰ্ত্তৱী দ্বাৱা অহংজ্ঞানৱৰ্ণণী তৃষ্ণাকে ছেদন কৱিতে পাৱিলৈ, নিখিল-সংসাৰভূষণ হইয়া অন্তৰ্বৰ্ণপে

হথে অবস্থান করিতে পারা যায়।” কিন্তু এখানেও সংশয় উপস্থিত হয়। দেহ অহঙ্কারের আবাসভূত। অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে দেহধারণ অসম্ভব হয়। যেমন জানুর শ্যায় মহিমু ঘূর্ণতাগই বৃক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে; তজ্জপ অহঙ্কারের অবলম্বনেই দেহ আছে। স্মৃতরাঃ অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই অবশ্য দেহ থাকে না। শ্রীরামচন্দ্রের ঐ সংশয় নিরসন অন্য মহামুনি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—“হে রাজীবলোচন! তত্ত্বজ্ঞেরা বাসনা-ত্যাগকে সর্বত্ত্বই ‘শেষ’ ও ‘ধ্যেয়’ এই দুই প্রকারে নির্দেশ করেন। তত্ত্বধ্যে আমি ইহাদের, ইহারা জীবন ও আমার, আমি ইহাদের সহিত পৃথক কেহই নহি; ইহারাও আমার ভিন্ন কিছু নহে;” এইরূপ নিশ্চয় তোমার মনে সতত রহিয়াছে; কিন্তু যখনই তুমি মনের সহিত বিচার করিয়া বুঝিবে যে, ‘আমি কাহারও নহি, আমারও কেই নহে’ তখনই, এই চরম-জ্ঞান তোমার শীতল বুদ্ধিতে বিকাশ পাইলেই, তোমার ধ্যেয় অর্থুৎ চিন্তনীয় দ্বিতীয় বাসনা ত্যাগ হইয়াছে বুঝিবে; এবং সমগ্র জগৎকে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবগত হইয়া জীব-নিজ প্রারক্ষের ক্ষয়ে যখনই ময়তাশৃঙ্খল হৃদয়ে দেহত্যাগ করে, তখনই তাহার জ্ঞেয়-সংজ্ঞক দ্বিতীয় বাসনা ক্ষয় সিদ্ধ হইল জানিবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারময়ী ও পুরোকৃত ধ্যেয়বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকেই জীবন্তুক্ত বলা যায়। হে রঘুনাথ! যিনি ছলনাময়ী বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করেন, তিনি জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত-পুরুষ বলিয়া অভিহিত। জনকাদি সুজন মহাজন মহাজ্ঞারা অনায়াস-ব্যবহারে ধ্যেয়-বাসনা পরিত্যাগ করতঃ শান্তি পাইয়া পরমব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাধব! এই দ্঵িবিধ বাসনাত্যাগীরাই জ্ঞানশালী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।” স্মৃতরাঃ বুঝা গেল,—বাসনাত্যাগেই মুক্তি।

* * *

বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে—আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে সে বাসনা-ক্ষয় হইতে পারে? কর্মের দ্বারা সেই বাসনার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যিনি বাসনা বা তৃষ্ণা-বিরহিত হইয়া শ্রেয়ঃকর্ম-সম্পাদনে সমর্থ হন, তাহারই বাসনার ক্ষয় হইয়াছে;—তিনিই স্মৃতলাভে সমর্থ হইয়াছেন। সেই শ্রেয়ঃকর্ম কিরূপ? শান্ত্রে কর্মের বিবিধ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। শুকর্ম কুকর্ম, কর্ম অকর্ম, বিকর্ম নৈকর্ম, প্রবৃত্তকর্ম

বিবৃত্তকর্ম, সৎকর্ম অসৎকর্ম প্রভৃতি কর্মের কতই পর্যায় দৃষ্ট হয়। সেই সকলের মধ্যে মেই কর্মই শ্রেয়ঃ কর্ম, যাহাতে জগতের হিতসাধন হয়,—যাহাতে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্মই কর্ম;—সেই কর্মই শ্রেয়সাধক;—সেই কর্মই অহংজ্ঞানের নাশ; সেই কর্মই দ্রুঃখ-নিরুত্তি;—সেই কর্মই স্ফুরসাধন, সেই কর্মই কামনার নিরুত্তি;—সেই কর্মই বাসনার অবসান।

• • •

মন্ত্রে সেই ভাবই পরিষ্কৃট। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবে যেন বলা হইতেছে,—‘হে অক্ষয় ক্ষরণশীল ইন্দ্রদেব ! আমরা সর্ববিধ যাগে আপনার উদ্দেশ্যে অম সমর্পণ করিতেছি ; আপনি আমাদের পুরুষার্থ-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন।’ ইহার মর্ম কি ? ‘সর্ববিধ যাগে আপনার উদ্দেশ্যে অম সমর্পণ করিতেছি’—ইহার তাৎপর্য এই যে,—‘আমাদের সর্ববিধ অঙ্গুষ্ঠানে আমাদের মনে যে কামনা-বাসনার উদয় হয়, যে অহংজ্ঞান জমে, সে সকলই, এমন কি কাম্য বস্তু পর্যন্ত, আপনার চরণে উৎসর্গ করিলাম। আপনি তাহা গ্রহণ করুন অর্থাৎ আপনার অঙ্গুষ্ঠানে আমাদের হৃদয়-কল্পের হইতে কামনা-বাসনা-রূপ শক্তনিচয় বিদূরিত হউক,—আপনি তাহাদের সংহার-সাধন করুন। আমাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হই।’ কামনা-বাসনা-ত্যাগে আন্তরিক দ্রুঃখ-নিরুত্তির বিষয় এবং অহংজ্ঞানের অবসানে পরাগতি-লাভের প্রসঙ্গ এই মন্ত্রে স্বপরিব্যক্ত। ভগবানের কর্ম করিতে করিতে, কর্মফল তাহাতে সমর্পণ করিতে করিতে, যখন অহংজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই পুরুষার্থ-সাধনের শক্তি আসে। ‘তাহার অঙ্গুষ্ঠানে হৃদয়ে এক অপূর্ব দৈববলের সঞ্চার হয় ; কামনা-বাসনার মোহঘোর কাটিয়া যায় ; রিপুশংক্রান্ত পলায়ন করে। হৃদয় অপূর্ব আলোকে উষ্টাসিত হইয়া উঠে। তখনই মনোময়কে মনোরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার সামর্থ্য আসে। তখনই ঐকাণ্ডিকতা জয়ে ; তখনই তাহার প্রতি আনুরুদ্ধি আসে। তখনই তাহাকে একেকশরণা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—‘তাহার চরণে আজ্ঞাসমর্পণ কর, সকল দ্রুঃখের অবসান হইবে।

— * —

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃঃ—

অগ্নিহোত্রা । কবিজ্ঞতুঃ সত্যশিত্রাবস্তুমঃ ।

দেবোদেবেভিরাগমৎ ॥

এই মন্ত্রে কয়েকটি অভিনব বিশেষণে অগ্নিদেবকে বিশেষিত করা হইয়াছে। অগ্নিদেবতাকে বলা হইয়াছে,—আপনি কবিজ্ঞতু। এ শব্দ বহুভাবযোগ্য। যাঁহারা আমুষ্টানিক যজ্ঞধর্ম সমাধানে অতী রহিয়াছেন, যজ্ঞকর্মের উপযোগিতা প্রতিপাদানে যাঁহারা জনসাধারণকে যজ্ঞকর্মে অতী করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার অর্থ এককল্প নিষ্পত্তি করিতে পারেন; আর যাঁহারা, অমুষ্টানের অতীত, সকল কর্মের শেষভূত, জ্ঞানয়জ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহার অন্য আর এক অর্থ সূচিত হয়। যাঁহারা লোকিক যজ্ঞকেই সারভূত বলিয়া মনে করেন, ‘কবিজ্ঞতু’ শব্দে তাঁহারা বুঝিতেছেন,—যজ্ঞনিষ্পাদনে অগ্নিদেবের স্থায় কর্মকুশল আর ছিতীয় নাই; —তিনি যজ্ঞকার্যের ক্রমবিজ্ঞানবিং, তিনি যজ্ঞকুণ্ডের ও সর্গলোকের সম্বন্ধ বিধান-পক্ষে প্রধান সহায়। তিনি যেন উভয় লোকের মধ্যস্থ-

হানীয় । যজক্ষেত্র হইতে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া, তিনি যেন দেবগণ-সকাশে যাজ্ঞিকের কৃতকর্মের বিষয় জ্ঞাপন করেন । আবার অন্ত পক্ষে ঈ ‘কবিক্রতু’ শব্দে বুঝাইতেছে—তিনি জ্ঞানময়, তিনি প্রজ্ঞানবৰ্কপ, তিনি ভূলোকে ছালোকে—সর্বলোকে জ্ঞানবৰ্কপে বিরাজমান আছেন ।

• • •

কবি ও ক্রতু যে দুই শব্দের যোগে ‘কবিক্রতুঃ’ পদ নিষ্পত্তি হইয়াছে, সেই দুই শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করিলে বুঝা যায়,—সর্বজ্ঞতা হেতু তিনি অস্তা (কবি, মনৌষী, পরিভূ, স্বযন্ত্র), আর সর্বজ্ঞবৰ্কপ বলিয়া তিনি বিষ্ণু । কবিক্রতু শব্দের যে কর্মকুশল অর্থ নিষ্পত্তি হয়, সে কর্ম—কোনু কর্ম ? সে কর্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ । ‘ক্রতু’ শব্দে—ইন্দ্রিয়কে বুঝায় । কবি শব্দে রশ্মি অর্থও সূচিত হয় । ‘কবিক্রতু’ বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযমশীল অর্থও উপলব্ধ হইতে পারে । যেমন দুর্দিম অঞ্চলে রশ্মির দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয়-সমৃহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখিতে পারেন, তিনিই কবিক্রতু । গীতায় শ্রীভগবান্ হিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, এতদ্বারা সেই ‘হিতপ্রজ্ঞ’ অবস্থাই বুঝাইয়া থাকে । যিনি অস্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনবৰ্কপ কামনা বা তৃষ্ণা বাহার আদৌ নাই, যিনি আস্তায় আস্তা-সম্মিলনে সর্বতোভাবে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থত্বরূপ আস্তা-সম্মিলনে সদা সম্মতিচ্ছি, তিনিই হিতপ্রজ্ঞ বা আস্তাজ্ঞানী । আবার, আপনাকে আপনি জানিয়া যিনি আস্তাময় হইয়া আছেন, তিনিই কবিক্রতু । শব্দ বিভিন্ন হইলেও বস্তুপক্ষে কোনই বিভিন্নতা নাই—উভয়ই সেই এক অবস্থা ।

• • •

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি কবিক্রতু ; মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি সত্য ; মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি চিত্রান্বস্তুমঃ অর্থাৎ অভিশয় কীর্তিমন্ত্র । এ সকল বিশেষণের তাৎপর্য কি ? শ্রীভগবান্—বিশেষণ-বিরহিত, আবার তাঁহার বিশেষণের অস্ত নাই । তিনি নিষ্ঠণ—গুণাতীত, আবার তিনি সম্মুণ—গুণময় । তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকার, আবার তিনি একাকার । অসম্ভব সম্ভব—তাঁহাতে কিছুরই অসম্ভাব নাই । একপ্রভাবে

পরম্পর বিরোধী বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য কি ? ইহার কি কোনও নিগৃঢ় কারণ নাই ? উক্ষেত্র এই যে, তাঁহাকে সকল দিক দিয়া সকল তাবে বুঝিতে হইবে। তাঁহাকে বলা হইল,—তিনি কবিজ্ঞান, তিনি সত্য, তিনি অশেষ কৌর্তসম্পর্ক। কেন এতাদৃশ গুণ-বিশেষণে সেই বিশেষণের অতীত নিষ্ঠ'গ বস্তুকে বিশেষিত করা হয় ? উক্ষেত্র—তোমাকে তৎসম্মিলনে পৌছিতে হইবে, তোমাকে তত্ত্বাবিত হইতে হইবে, তোমাকে তদুগ্রণে গুণাত্মিত হইতে হইবে। যাহার জন্ম নাই, তাহার আবার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে ? কর্ম করিলে তো কর্মের ত্যাগ করা সম্ভবপ্রয়োগ হয় ? যে কখনও কোনও কর্মই করিল না, তাহার পক্ষে কর্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব ? যে গুণের অধিকারী না হইল, সে কেমন করিয়া গুণাত্মিতে পৌছিতে পারিবে ? আগে গুণের অধিকারী হও, তবে তো গুণাত্মিত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে ? গুণ-বিশেষণ দেখিয়া, গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও ; তবে তো গুণময়ের সম্মিলন লাভ করিবে ? যে মুর্দ, যে জন পাণ্ডিতের অধিকারী নহে ; পাণ্ডিতের সম্মিলনে অবস্থিতি—পাণ্ডিতগণের সহবাস-লাভ তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপ্রয়োগ কি ? যে অসৎ, যে চৌর, সে কি সত্ত্বের সম্মিলনে তিষ্ঠিতে পারে ?

• • •

বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের অনুসারী হইতে হইবে। যে চিন্তা, যে ধ্যান, যে জ্ঞান লইয়া জীব, কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে ; সে তত্ত্বাবহি প্রাপ্ত হয়। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ করা যাব, সেই গুণে গুণাত্মিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান-বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুসরণে, জীব যে অনুস্থত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপস্থ প্রাপ্ত হয়, শ্রীমন্তাগবতের একটা দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীভৃত দেখি। ভগবৎবৈরিগণ, বৈরিভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়াও, মুক্তি-লাভ করিয়াছিল। সেই বিষয় বুঝাইবার জন্যই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমন্তাগবতে বলা হইতেছে,—

“এনং পূর্বকৃতং যত্ক্রাজ্ঞানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ ।

অহস্তেহস্তে তদাঞ্জানঃ কীটঃ পেশক্ষতো যথা ॥”

অর্থাৎ,—‘কীট যেমন, পেশক্ষতকে (কুঘীরক পোকাকে) স্মরণ করিতে করিতে তত্ত্বপত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই কৃষ্ণবৈরী রাজগণ, পূর্বকৃত বৈরতাজনিত

পাপের বিশ্বানতা-সন্তেও অন্তকালে তজ্জপ স্বাক্ষর-মুক্তি লাভ করিয়া-
ছিলেন।' শ্রীভগবান् তাই এ বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

“বিষয়ানু ধ্যায়তচ্ছিতৎ বিষয়েয়ু বিষজ্ঞতে ।

মামমুশ্রাতচ্ছিতৎ মধ্যেষ প্রবিলীয়তে ॥”

অর্থাৎ,—‘বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাণ হয় ;
আর তগবানের অনুসরণ করিতে করিতে মানুষ তগবানেই লীন হইয়া
থাকে।’ জগন্মীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উপাদান হয়, গুণময়ের যে গুণকথা
গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুসরণ করিতে উপদেশ
দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কি আছে ? তাহার কারণ এই যে,
তাহার মেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তজ্জপে রূপান্বিত, তদ্গুণে
গুণান্বিত, তন্ত্বাবে ভাবান্বিত, তৎস্বরূপে লয়প্রাণ হইতে পারা যায় ।

* * *

চুৎখের দ্বাবদাহে দক্ষীভূত হইয়া সংসারের জ্বালামালায় জর্জরিত
থাকিয়া, মানুষ অহনিশ পরিত্রাহি ডাক ডাকিতেছে। কি প্রকারে এই
চারণ চুৎখের নিয়ন্ত্রিত হয় ? কি প্রকারে এই জ্বালা-যজ্ঞণার মধ্যে শাস্তির
পুতুরারা বর্ধিত হয় ? সারা সংসার ব্যাপিয়া তাহারই সন্ধান চলিয়াছে।
কোথায় মোক্ষ ? কোথায় নিঃশ্বেষ্যস ? কোথায় মুক্তি ? কি প্রকারে
সে মুক্তি অধিগত হয় ? সকলেই মেই সন্ধানে বিষম বিভ্রত ! কিন্তু
কেহই মে তত্ত্ব সন্ধান করিয়া পাইতেছেন না। অথচ শাস্তি, ইঙ্গিতে সে
তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন,— মুক্তি পঞ্চ-বিধি ;—
“সামোক্য, সাষ্টি”, সামীপ্য, স্বাক্ষর, সামুজ্য (একত্ব)। সমান লোকে
বাস করার নাম—সামোক্য-মুক্তি। সমানরূপ ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্যবান् হওয়ার
নাম—সাষ্টি’ মুক্তি। সামীপ্য বা বৈকট্যজনিত যে মুক্তি, তাহারই নাম—
সামীপ্য মুক্তি। সমান-রূপে রূপান্বিত হওয়ার নাম স্বাক্ষর মুক্তি। আর
সামুজ্য বা একত্বরূপ মুক্তিই অভেদ-ভাব। এই মুক্তিতে তিনিও নে,
তুমিও মেই। এই পঞ্চবিধি মুক্তির এক এক বিভাগকে এক একটীর
ন্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। সমান লোকে বাস করিবে ? সমান
গুণসম্পন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হও। তিনি সত্য-স্বরূপ, তিনি ন্যায়স্বরূপ,
তিনি বিজ্ঞানগ্রহ। তাহার সমান গুণসম্পন্ন হইতে হইলে, তোমাকেও

শ্যাম-স্বরূপ, সত্য-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ হইতে হইবে। হও—সত্যপর, হও—শ্যামপর, হও—জ্ঞানের অধিকারী ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান লোকে বাস করিতে পারিবে ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্যবান् হইবে ! তবে তো ক্ষমে ক্ষমে, সমান লোক সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার নৈকট্যলাভে সমর্থ হইবে ! নৈকট্য হইলেই স্বরূপ অবগত হইবার অবসর আসে। স্বরূপ অবগত হইলেই রূপে রূপ শিশাইবার, আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটাইবার, "প্রযত্ন হয়। রূপে রূপ মিশিলে, আত্মায় আত্মসম্মিলন হইলে, তখন আর ভেদভাব বিদ্যমান থাকে না। তখন সমুদ্রের জল নদীর জল এক হইয়া যায়। মনে অগ্নিদেবকে গ্র সকলবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্যই এই যে, তোমরা সকল গুণে গুণান্তিত হও। তিনি যেমন চিত্তবন্ধন, অর্থাৎ বিচিত্র কীর্তিমান, তুমিও সেইরূপ বিচিত্র কীর্তিমান হও ! তিনি যেমন দেবতা অর্থাৎ স্বপ্নকাশ ও দানাদি-গুণযুক্ত, তুমিও সেইরূপ আপন গুণে, দয়াধর্মদানাদি-গুণ দ্বারা, সত্য-সরলতা-শ্যামপরতা প্রভৃতি গুণে স্ফুরিত হইয়া, স্বপ্নকাশ হও। এই শিক্ষাই স্বর্ণ শিক্ষা।

* * *

এ মন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে,—এই যজ্ঞে দেবগণের সহিত আপনি আগমন করুন। পূর্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছিল,—দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করুন ! এই মন্ত্রে বলা হইতেছে,—তাঁহাদিগকে লইয়া আপনি এই যজ্ঞে আনুন। সেই মন্ত্রের পূর্বে মন্ত্রের সামগ্র্য-সাধনে বেশ উপলক্ষ হয়; যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন, যাহাকে বহু নামে পরিচিত করা যায়, যাহার বিষয় বহুভাবে ব্যক্ত হইতে থাকে, তিনি, বহু হইলেও এক, এক হইলেও বহু। এই অন্যই প্রতি বলিয়াছেন,—“এক এব বহুস্তাম।” এখানে তাই বলা হইতেছে,—তুমি সকল রূপে এস, তোমার সঙ্গেই যেন সকল রূপ প্রকাশ পায়। অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে তোমার যে বিভূতি, সে বিভূতি প্রকাশ পাউক, আর, অন্যান্য দেবতারূপেও তোমার যে বিভূতি, আমার অন্তরে তাহাও প্রকাশ প্রাপ্ত হউক।

— • —

জ্ঞান-বেদ ।

—: * : —

উপপ্রস্তোত্বধরং মন্ত্রং বোচেমাঘয়ে ।

আরেহর্ত্স্যে চ শৃণতে ॥

* * *

ভগবান् কত দিনে কবে আমাদিগকে পিতার স্মেহে জ্ঞানে ভুলিয়া
লইবেন ? . কত দিনে কবে আমরা আমাদিগের এই পতনের অবস্থা হইতে
পরিআশ পাইব ? এই—এই আকাশ—মানুষের মনে যখন জাগিয়া
উঠে, তখনই মানুষ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় । এই দেখন—বেদ-মন্ত্র
অমুসন্ধিৎসুদিগকে সেই সন্ধান—সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন ।
বেদ-মন্ত্র অমুস্মারণ করুন দেখি ! এই শুনুন—বেদ আমাদিগকে কি কথা
কেমন ভাবে বলিয়া যাইতেছেন ! বেদ বলিতেছেন—

উপপ্রস্তোত্বধরং মন্ত্রং বোচেমাঘয়ে । আরেহর্ত্স্যে চ শৃণতে ॥

* * *

সংসার-দ্যুরে 'নিত্য-বিধৃত' মানুষ, কেবলই হতাশে প্রমাদ-গণনা
করিতেছে । পথ দেখিতে পাইতেছে না । উপায় কি হইবে, কিছুই
হির করিতে পারিতেছে না । তাই ভয় পাইতেছে । মানুষের ঝুঁতি-
পুঁতি-পুঁতি মানুষকে সহস্র বুঝিতে দেয় না যে, ভগবান্-কেমন ভাবে
কোথায় আছেন বা কি একারে তিনি আমাদিগের প্রার্থনা শুনিতে
পাইবেন । তিনি এই চর্চাকে পরিদৃশ্যমান নহেন ; স্বতরাং তাহার
অস্তিত্বই অনেক সময় অঙ্গীকৃত হয় না । আমাদিগের প্রার্থনা যে তিনি

শুনিতে পান বা শুনিয়া থাকেন,—এ পক্ষে সে অসঙ্গ ঝুঁকারে উড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, মন্ত্র বলিতেছেন,—‘কে বলে—তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনিতে পান না ? কৈ—একবার ডাকিয়া দেখ দেখি ! বুঝিবে—নিশ্চয় তিনি সে ডাক শুনিতে পাইবেন।’ তবে সে ডাকা—কেমন-ভাবে ডাকা, সে আহ্বান—কেমন আহ্বান, তাহার বিশেষস্বৃষ্টিকুল জানা আবশ্যিক। তুমি সদা-কুকৰ্ম্মকারী কদাচারী; তুমি পরীক্ষার জন্য একবার তোমার ইচ্ছামত সন্তুষ্যণ করিলে; আর, তাহার কোনও প্রত্যুত্তর হয়, তো পাইলে না ! অমনই তোমার ধারণা হইল,—তিনি নাই অথবা তিনি কিছুই শুনিতে পান না। কিন্তু তাহা বলিলে তো চলিবে না ! তিনি শুনিতে পান—এমন ভাবে কি তাহাকে ডাকিয়াছ ? কৈ—কখনও তো না ! হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পার—সে ভাব কিরূপ ?

• • •

মন্ত্র তাহাই তো উপদেশ দিলেন ! মন্ত্র কহিলেন,—‘তোমার আহ্বান তিনি অবশ্যই শুনিবেন। কিন্তু সে পক্ষে, প্রথমতঃ তোমাকে সৎকর্মশীল হইতে হইবে,—তোমাকে হিংসা-প্রত্যবায়াদিরহিত যজ্ঞের বা সৎকর্মের সম্যক অনুষ্ঠান করিতে হইবে; তার পর, পরিত্রাণকারক শব্দ-অঙ্গুলপ বেদমন্ত্র উচ্চারণে তাহাকে আহ্বান করিতে হইবে। আর, সে আহ্বানের লক্ষ্য থাকিবে—জ্ঞানলাভ—জ্ঞান-স্বরূপ তাহার সামিধ্য-প্রাপ্তি।’ মন্ত্র বলিতেছেন—‘তাহা হইলেই তোমার প্রার্থনা তাহার নিকট পৌছিবে। তিনি দূরেই থাকুন, আর নিকটেই থাকুন—সে ভাবনা তোমার আর ভাবিবার আবশ্যিক হইবে না। তোমার প্রার্থনা—তোমার মন্ত্র—তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন।’ একবার এইভাবে তাহাকে ডাকিয়া দেখ দেখি ! তাহাকে ডাকিয়া তো সাড়া পাও না ? দেখ দেখি—সাড়া পাওয়া যায় কি না ! দেখ দেখি—তিনি তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তোমার সে প্রার্থনা পূরণ করেন কি না ! দেখ দেখি—মন্ত্রের বাণী সফল হয় কি না ! দেখ দেখি—কি মর্শ কি উদ্বোধনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া কি জনহিত-সাধন-উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রকটিত আছে ! মন্ত্র অনুধ্যান কর—মন্ত্রাচিত কর্ষে প্রবৃত্ত হও। দেখ দেখি—সাক্ষল্য লাভ হয় কি না ! দেখ দেখি—বিজয়শ্রীর অধিকারী হও কি না ?

জ্ঞান-বেদ !

—ঃঃ * ঃঃ—

৩ ১৭ ৩ । ৩ ১ ২৮ ৩ ২ ৩ ২ ।
যুহুর্যো হি ভানবেহৰ্ষা দেবাশাশ্বয়ে ।

১ ৩ । ২ । ১ ২ । ৩ ২ ৩ ২
য় ৰ মিত্রং ন প্রশংস্য মৰ্ত্তাসো সংখ্যে পুনঃ ॥

মন স্বভাবতঃ নিতান্ত চক্ষল ; শরীরেন্দ্রিয়কে বিক্ষোভিত করিয়া তৎসমূহকে বিবশ করাই মনের প্রকৃতি । বহু দম্ভ্য মিলিত হইয়া যেমন একজন পাহুকে বিমুক্তি করে, তজ্জপ মনাদি ইন্দ্রিয়গণ অসহায় আস্থাকে প্রমথিত করিতে থাকে । বিষয়ত্তোগের বাসনা হইতে তাহাকে নির্মুক্ত করা কোনকৃমেই সম্ভবপৱ হয় না । নিরস্তর অসংধ্য বিষয়-বাসনা পরিবৃত হইয়া মন যেন সর্বদা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । অরণ্যচারী মত-মাতঙ্গের গতি যেমন কিছুতেই সংযত হয় না, অথবা বিমানচারী বায়ু যখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ করা যেমন অসম্ভব ; মেইরূপ মনের গতি নিরোধ করাও দ্রুঃসাধ্য ।

‘জ্ঞানার্থী’ অর্জুন তাই বড় ক্ষেত্রে ‘শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন,—
‘চক্ষলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাধি বলবদ্ধং । তত্ত্বাহং নিশ্চিহ্ন মন্ত্রে বয়োরিব’

হস্তকরং।” প্রতি বলিয়াছেন,—“আজ্ঞানং রথিনং বিক্ষি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিস্ত সারথিঃ বিক্ষি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইত্ত্বিয়াণি হয়ানাহৃবিদ্যাঃ-তেজু গোচরান्। আজ্জ্বেত্ত্বিয়মনো যুক্তো ভোক্তেত্ত্বাহৃশ্রনীষিণঃ।” অর্থাৎ,—আজ্ঞাকে রথি-স্বরূপ, শরীরকে রথ-স্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথি-স্বরূপ, মনকে বশগা-স্বরূপ এবং ইত্ত্বিয়মস্মৃহকে অধি-স্বরূপ আনিবে।’ স্বতরাং বিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত ও নিয়মিত করা কর্তব্য। কিন্তু তাহা অতীব দুর্লভ। অতি সূক্ষ্ম সূচীর দ্বারা যেমন লোহকে সহসা তেজ করা যায় না, তজ্জপ বুদ্ধির দ্বারা মনকে তেজ করা সহজসাধ্য নহে। তাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের—মনকে সংযত করিবার—প্রকৃষ্ট পদ্মা জানিবার জন্য অর্জুন শ্রীতগবানকে প্রাপ্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

* * *

মন যে স্বত্ত্বাবতঃ চঞ্চল, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যে অতি স্বকঠিন, শ্রীতগবানও তাহা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া গিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন,—‘হস্তু বশীভূত না হইলে, বাহেত্ত্বিয়ের নিরোধে কোনই শঙ্খল-লাভ হয় না। যদি বলা যায়, দর্শনেত্ত্বিয়ই মনকে বিপথে পরিচালিত করে, অথবা শ্রবণেত্ত্বিয়ই মনকে বিপথে লইয়া যায়, কিন্তু একপ উক্তি ও সঙ্গত নহে। কারণ, লোভজনক পদাৰ্থ দর্শন না করিলেই, অথবা শ্রীতজনক স্বর শ্রবণ না করিলেই যে মন সংযত হইল, তাহা নহে। মন যদি তৎসমূদায় উপ-ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে সৎসমূদায়ের নিরোধে কোনই ফললাভ হয় না।’ স্বতরাং কি উপায়ে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইতে পারে—কি প্রকারে মনকে জয় করিতে পারা যায়, তাহাই অনুধাবনার বিষয়। অগবাম তাহার পদ্ম-প্রদর্শনে বলিলেন,—“অত্যামেম তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেব চ মৃহুতে।” অর্থাৎ, (একমাত্র) অভ্যীস ৩০ বৈরাগ্যের দ্বারাই মনকে নিরোধ করা যাইতে পারে।

* * *

অজ্ঞানতা—চাঞ্চল্যের মূলীভূত। বিষয়বাসনাদি ভোগলালসা—সেই অজ্ঞানতা হইতেই মধুৎপত্তি। অজ্ঞানতাই মনকে উদ্বাগগামী করে; অজ্ঞানতাই চিত্তবৃত্তি-সমূহকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিয়া থাকে। অজ্ঞান-মূল বিনষ্ট হইলে, চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়,—মনঃস্মৈর্য্য সম্পাদিত

হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞানতা কিরণে দূরীভূত হয়? জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশ হয়; জ্ঞানোদয়ে সদসৎ বিচার-শক্তি জন্মে; জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ের সকল আবিলতা বিদ্যুরিত হইয়া থাকে; জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ে সম্ভাব দেবতাবের সংকার হয়। সদসৎ-বিচার-শক্তির পরিষ্কুরণে, চিত্তের নির্মলতা জন্মিলে, চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়,—বিষয়-বাসনা ভোগাদিকামনা বিধ্বংস হইয়া থাকে। এই অবস্থাই বৈরাগ্য—এই অবস্থায়ই চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভবপর। স্মৃতরাং এ পক্ষে জ্ঞানই যে প্রধান সহায়, তাহা বল্যাই বাছল্য। অস্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে, রজঃ ও তমঃ তিরোহিত হয়। তখন কেবল সত্ত্বগুণে হৃদয় অধিকার করে। মেই সত্ত্বগুণ-প্রভাবে হৃদয়-ক্ষেত্র স্বচ্ছ আলোকে উজ্জ্বাসিত হয়। সত্ত্বভাব—দেবতাব। ধত্কণ সেই দেবতাব অস্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনতা তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিষ্টের উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষুটিত হয় না, মনের মলিনতা দূর না হইলেও সেইরূপ পরমেশ্বরের দর্শনলাভ সম্ভবপর হয় না। স্মৃতরাং মনের মলিনতা, অস্তরের কলৃষ্টতা দূর করিয়া হৃদয়ে দেবতাবের উশ্মেষ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের আবশ্যক হয়। জ্ঞানাধিপতি ভিন্ন সে জ্ঞান অন্য আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? তিনি জ্ঞানাধিপতি; তিনি হৃদয়ে দেবতাবনিবহের জনয়িতা।

* * *

শার্ষোভূত বেদ-মন্ত্রে সাধক উদ্ধাম মনকে সংযত করিবার অভিপ্রায়ে কঠিতেছেন,—‘হে মন! যদি পরমার্থলাভে অভিলাষী হইয়া থাক, তাহা হইলে ভক্তিসহকারে জ্ঞানদেবতার ভজনা কর। মেই জ্ঞানদেবতা নিখিল জগতের আরাধ্য।’ তিনি নেতৃস্থানীয়। তিনিই সকলকে ভগবানের নিকট উপস্থাপিত করিতে সমর্থ। তিনিই ভগবানকে আনয়ন করিয়া সাধকগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তিনি অশেষ দৌষিঘান; তাঁহার দৌষিতে জগৎ আলোকিত হয়। তাঁহার অধিষ্ঠানে সাধকগণ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া থাকে। স্মৃতরাং সুমি সেই জ্ঞানদেবতার অর্চনা কর, অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠায় ও ঔৎকর্ষসাধনে প্রয়ত্নপর হও। তাহা হইলে তোমার পরামর্শ লাভ হইবে। জগতের সকল পরামর্শই তাঁহা হইতে

উত্তুব হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয় ! অনস্তু তিনি ; তাই তিনি জন্মগতি-
নিবারণ-সমর্থ। তাঁহাতে একবার আশ্রয় লইতে পারিলে, পুনঃপুনঃ
গতাগতির সন্তাননা থাকে না। ফলে, জন্মকারণ নিবারিত হয়, জন্মগতি
.রোধ হয়।' যেখানে আশ্রয় লইলে আর অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধানে
ফিরিতে হয় না, যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে আর সংসার-বন্ধন-
ভয়ে ভীত হইতে হয় না,—তাঁহার ঘ্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কি থাকিতে
পারে ? পথিক পথভর্ত—বড়বাঙ্গাবাত্যানিপীড়নে নিপীড়িত ! সে যদি
একবার আশ্রয়ের সন্ধান পাইয়া আশ্রয় লাভ করিতে পারে, সহসা সে
তাহা পরিত্যাগ করিতে চায় কি ? মেইরূপ সংসার-অরণ্যে পথভর্ত
পথিক আমরা। দ্রুঃখ্যাবদাহে সদা দুঃখীভূত হইতেছি। সন্ধান করিয়া
ফিরিতেছি,—কিসে সে ছুঁধ নিবারিত হয়, কিসে জন্মজরামৃত্যুর কবল
হইতে পরিত্বাণ পাইতে পারি। এমন আশ্রয় স্থান আমাদের কি আছে,—
যেখানে আশ্রয় লইলে সকল সন্তাপ সরূল জালা নিবারিত হয় ! তখন
যদি তাঁহার ঘ্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের সন্ধান পাই, তাহা হইলে সে আশ্রয়
পারত্যাগ করিবার প্রয়োগ আসে কি ! পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান् আমাদের
সেই আশ্রয়হল—যে আশ্রয়ে উপনীত হইতে পারিলে আর গতাগতির
সন্তাননা থাকে না,—পরাগতি পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়।

জ্ঞান-বেদ ।

— : * : — —

ইন্দ্ৰায়াহি চিন্মানো সুতা ইমে ভায়বঃ ।
— — —

অধৌভিস্তনা পুতামঃ ॥
— —

* * *

মন্ত্রটী কি গভীর ভাবমূলক ; অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে
কল্পিত করা হইয়াছে ! সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—সোমরস-
ক্লপ মাদক-জ্বব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলির ধারা পরিকার করিয়া রাখা হইয়াছে ;
সেই পরিক্রিত সংশোধিত মাদক-জ্বব্য ইন্দ্ৰদেবকে যেন পাইবার কামনা
করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মন্ত্রপান করুন,—ইহাই যেন
এই মন্ত্রের একমাত্ৰ প্রার্থনার বিষয় ।

* * * * *

এই মন্ত্রে একটী নৃতন শব্দ—“অধৌভিঃ সুতাঃ ।” তাহার অর্থ
দীড়াইয়াছে—অঙ্গুলির ধারা সুসংস্কৃত । তদমুসারে ঋষিগণের বা ঋষিক-
গণের অঙ্গুলির ধারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,—এইকল্প অর্থ
নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,—সোমলতার মনের
উপরে ফেনা পড়িয়াছিল ; ঋষিরা আঙুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিকার
করিয়া রাখিয়াছেন ! কিন্তু কত দুর্বাস্যে ঐকল্প অর্থ নিষ্কাশণ করা হয়,

তাহা অনুধাবন করিলে বিশ্বয় আসে। ‘অণু’ শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর দ্বালিঙে ‘উদ্ধৃ’ প্রত্যয়ে ঈশ্বর সিদ্ধ। তাহারই ভূতীরার বহুবচনে ‘অধীভিঃ’ (‘অধী’ হইতে) মিশ্রণ করা হয়। অঙ্গুলিয়ে সূক্ষ্মতা আছে যদিয়া দ্বালিঙ্গাত্ম ঈশ্বর অঙ্গুলি অর্থ সূচনা করে। অর্থও উপরূপারে হইয়া আসিতেছে! কিন্তু যদি ‘অণু’ শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক শুধু অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত তাৰ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই শুধু অর্থের অনুসরণে, আমৰা তাই ‘অধীভিঃ’ পদের প্রতিবাক্যে ‘অণুপারমাণুরূপেः’ পদ গ্ৰহণ কৰি। ‘হৃতাঃ’ পদ দেখিয়া ‘হৃসংকৃত সোম বা মানক-জ্বর্য’ অর্থও গ্ৰহণ কৰা হয় না। পৰম্পৰা এহলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুক্ত অতি-উপর্যোগী বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

* * *

প্রথমতঃ, এখানে বারিবৰ্ষণে ধৰণীয় শৈত্যসম্পাদনের ও স্নিফ্টাসকলের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,— বিচিৰ-জ্যোতিশানের জ্যোতিতে সংসারের ক্ষেত্ৰাশি দৃঢ়ীভূত হইয়া সূক্ষ্ম-বাঞ্চপূৰ্ণে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আময়ন কৰিতেছে। ইন্দ্ৰ—মেঘাধিপতি। বাস্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সমল বিমল সৰ্ব-প্ৰকাৰ জলীয় পদাৰ্থ বাঞ্চপাকারে অণু-পৰমাণু-জন্মে অভিমৰ্ব-জ্ঞপ ধাৰণ কৰিয়া মেঘে পৰ্যবেক্ষিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বৰ্ণনা আছে,— মনে কৱা যাইতে পারে। “অধীভিঃ হৃতাঃ” তোমাকে পাইবাৰ কামনা কৰিতেছে; অৰ্থাৎ পার্থৰ জলৱাশি—নদী-হৃদ-তড়াগাদি—তোমাৰ নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদেৱ স্তুল দেহ, তোমাৰ নিকট পৌছিবাৰ পক্ষে অস্তুৱায় হইয়া দাঢ়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমাৰ সহিত মিলিবাৰ উদ্দেশ্যে ধাৰমান হইয়াছে। তাহাদেৱ সেই একাগ্ৰতাৰ ফলে, ভূমি বারি-জ্ঞপে বিগলিত হইয়া তাহাদেৱ অস্তে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,—তাহাদিগকে পৰিবৰ্ত্ত কৰিতেছ। মনে হয়, সারা সংসাৱ—প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সামগ্ৰী—অণুরূপে তোমাৰ চৱণে মিলিবাৰ অন্য ব্যগ্ৰতাৰ প্ৰকাশ কৰিতেছে।

* * *

মানুষ কি তাহা পারে না ? আমরা কি সেন্লোপভাবে, হে ভগবন, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না ? জন্ম-জন্ম-মরণ-ধৰ্মসমূল এই পার্থিব দেহ—পাপপক্ষপূর্ণ মায়াময় এই মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরেই চিরনিময় রহিবে ? . এই ঘন্টা মেই হতাশে আশাম প্রদান করিতেছে ; বলিতেছে,—“তোমাতেও তো সোমস্থাসুক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে ! সুল দেহের পর সুক্ষ্ম দেহ আছে ; সুল ইঞ্জিয়ের অতীত সুক্ষ্ম ইঙ্গিয় রহিয়াছে । তোমার হৃদয়, তোমার অস্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই সুল নহে ! তাহারাই তো তোমার সুক্ষ্ম সুক্ষ্মাদপি-সুক্ষ্ম অভিব্যক্তি ! পবিত্র হইলে, তাহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে ? সেই সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম তোমার অস্তর —সে কেন ভগবন্তরণে বিলুপ্তি হয় না ! তোমার মনোভূমি কেন এই পার্থিব সংসার-পক্ষে মজিয়া রহিয়াছে ?—সে কেন তচ্ছরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না ! শরণ লও—তাহার ! আশ্রয় কর—তাহার চরণ-পদ্ম ! মত হও—তাহার প্রেমস্থাপনে ! তবেই স্বসংস্কৃত সোঁম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাকেয়ৱ. সার্থকতা হইবে । তবেই তো সোমপানেছ্বা বলবত্তী হইবে—তাহার । তবেই তো দ্রবীভূত শ্রেষ্ঠরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি ? তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্মল করিয়া, অনুপরমাণুক্রমে তাহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি ! তবেই তো প্রাণগতি লাভ হইবে—তোমার !

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃ* * ঃ—

১২ ৩২ ০১ ২০ ১২ ০ ১২
পুরং সত্ত্ব ইঞ্চাধিয়ে দিবোদাসায় শন্মুহম্ ।

২০ ২ ০ ২০ ১২
অধ ত্যো তুর্বিশং যদুম্॥

মানুষ যখন পার্থির সাহাধ্য-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাহা লাভ করিবার অথবা তৎসাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার আশায় জলাঞ্চলি দিতে বাধ্য হয়, তখনই সে উপায়ান্তর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি সত্যসত্যই অনুসঙ্গিঃসা থাকে, তাহা হইলে সহজেই জানিতে পারে যে, একমাত্র ভগবান् ব্যতীত মানুষের প্রকৃত বন্ধু অন্য কেহ নাই। তিনি মানুষকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন ! মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই সে ভগবানের নিকট হইতে পাইতে পারে ;—কেবল তাহার নিকট চাহিবার মত চাহিতে হয়। মানব ! তুমি রিপুশক্রষ্ণ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ; তাহার নিকট রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা কর ; তিনি তোমার রিপুনাশ করিবেন। তুমি কাঙ্গাল দীন দরিদ্র ; তাহার নিকট ধন প্রার্থনা কর ; পরমধন প্রাপ্ত হইবে। তিনি যে অনন্ত কুবের-ভাণ্ডারের অধিপতি । যিনি সৌভাগ্যবশে সেই পরম পুরুষের শরণাগত হন, তাহার রিপুত্ত্য থাকে না, তাহার কোনও আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে না ।

তাই শ্রবণ যখন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, বিমাতা কর্তৃক অপমানিত হইয়া, মাতার নিকট আসিয়া সেই পরম দুঃখবার্তা জ্ঞাপন করিলেন; তখন সেই মহীয়সী মহিলা রোগের প্রকৃত ঔষধ নিরূপণ করিয়া বলিলেন,—“তুম কি বৎস! দুঃখ করিও না। সামাজিক পার্থিব রাজ্যসম্পত্তি পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছ? তুমি সেই রাজাধিরাজ পরমদেবতার শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমাকে অপার্থিব রাজ্য-সম্পত্তি প্রদান করিবেন—যে সম্পদের নিকট সমাগরা পৃথিবীর আধিপত্যও অতি-তুচ্ছ অতি-নগণ্য। তুমি সেই পরমপুরুষের শরণাপন্ন হও;—যাঁহার কটাক্ষে সাত্রাজ্যের উপান-পতন হইতেছে, যাঁহার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি-প্রলয় সাধিত হইতেছে, তিনি তোমাকে এমন সাত্রাজ্য প্রদান করিবেন, যাহার নিকট পৃথিবীর সকল সাত্রাজ্যই হীনপ্রভ, হইয়া যায়। তুমি তোমার পিতার ক্ষেত্রে স্থান পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না; তুমি সেই পরমপিতার—জগৎপিতার ক্ষেত্রে স্থান লাভ করিবার জন্য যত্পরায়ণ হও, দেখিবে,—তোমার কোনও দুঃখ থাকিবে না, তোমার সকল অভীন্ত সিদ্ধ হইবে। বৎস, পার্থিব সম্পত্তি, পার্থিব সম্মান তো অতি তুচ্ছ—ক্ষণমাত্রস্থায়ী! তুমি যদি সেই সত্রাটের সত্রাট, পিতার পিতাকে ডাকিতে পার, তবেই তোমার সর্বার্থসিদ্ধি হইবে। তবেই তোমার সকল অভীন্ত পূর্ণ হইবে।”

• • •

সেই মহীয়সী রমণীর বাণী সফল হইয়াছিল। জগৎপিতার ক্ষেত্রে শ্রবণ স্থান লাভ করিয়াছিলেন,—যে স্থান পাইবার জন্য মুনীন্দ্ৰগণ চিৱলালায়িত, যে স্থান রাজাধিরাজের স্বশ্রেণও আগোচৰ। পার্থিব সম্পত্তি কামনা করিয়া শ্রবণ সাধনা আৱণ্ণ করিলেন; ভগবানের ধ্যানে ভগবদ্বারাধনায় তদৰ্থ হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান् তাঁহার সেবকের কান্তিৱ আহ্বান উপেক্ষা কৰিতে পারিলেন ন। তিনি আসিলেন, তাঁহার ভক্তকে ক্ষেত্রে তুলিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোনু সম্পত্তি চাও?’ তখন শ্রবের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছে। তিনি কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কাচের সন্ধানে আসিয়া তিনি কাঞ্চন লাভ কৰিয়াছেন;—মাটি কাটিয়া কোহিমুৰ লাভ কৰিয়াছেন। মনে হইল, তাঁহার মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও আশীৰ্বচন,—“তাঁহাকে ডাক, পরমস্থান

আপন হইবে,— যে স্থান তোমার পিতা কঙ্গনায়ও আনিতে পারেন নাই !’
ঞ্চ বুঝিলেন—মায়ের আশীর্বাদে, ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন, পরম
সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। তাই বলিলেন,—‘আমার তো আর
চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। যখন আপনার শ্রীচরণাঙ্গয় পাইয়াছি,
তখন আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। আপনার শ্রীচরণই আমার
একমাত্র সম্পত্তি। আমিযেন আপনার ক্ষেত্রে হইতে দূরে না যাই।”

• • •

কলতঃ, যে কোনও কারণেই মানুষ ভগবদ্বারাধনায় নিযুক্ত হউক না
কেন, তাহা মঙ্গলপ্রসূ হইবেই। সৎকার্য্যের সাধনে মঙ্গল-লাভ বা কল্যাণ-
লাভ ঘটিবে। যিনি অনন্ত মঙ্গলের আকর, যাহার ছায়াস্পর্শে জগৎ মঙ্গলের
পথে অগ্রসর হয়, সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে আত্মিবেদন করিলে মানুষ
নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করে। কখনও তাহার অন্যথা হয় না। ভগবান्
নিজে তাহার ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন, নিজে তাহাকে হাতে ধরিয়া
আপনার ক্ষেত্রে তুলিয়া লয়েন। এই সত্যটাই বর্তমান মন্ত্রের মধ্যে বিরুদ্ধ
হইয়াছে। * যাহারা সত্যকর্মা, যাহারা ভগবদ্বারাধনাপরায়ণ, তাহারা
ভগবানের কৃপায় সর্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ভগবান্ নিজে
তাহাদের রিপুনাশ করেন, তাহাদিগকে পরম সম্পদের অধিকারী করেন।
ভগবান্ তাহার দুর্বল সন্তানদিগকে প্রবল রিপুদিগের আত্মণ হইতে রক্ষা
করেন, তাহাদিগের মুক্তির পথ সহজ রূগম করিয়া দেন !

* *

* কি অকারে মন্ত্রটাতে ঐ তাৎ আপন হওয়া যায়, আমাদিগের মর্মানুসারিত্বী-
ব্যাখ্যার তাহার আত্ম আছে। বধা,—

হে ভগবন्। এং ‘ইধাধিষ্ঠে’ (সত্যকর্মণে) ‘দিবোদাসাং’ (ভগবদ্বারাধনাপরায়ণায়,
তত্ত্ব সুত্তিলাভাত্ত ইত্যৰ্থঃ) ‘ভ্যং’ (অসিদ্ধঃ) ‘শব্দং’ (শক্তপূর্যাণঃ স্বাত্মিনঃ, অবলরিপঃ)
‘অধঃ’ (তত্ত্বঃ, তথা) ‘দুর্বলঃ বহুঃ পুরঃ’ (জ্ঞানতত্ত্ববিদ্বাত্তকানি পুরাণি, জ্ঞানতত্ত্বনাশকান্
রিপুন् ইতি তাৎঃ) ‘সত’ (ক্ষণাদেব, সদ্বেব) বিনাশগ্রসি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ
অয়ঃ যজ্ঞঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকানাং রিপুনাশঃ করোতি ইতি তাৎঃ।

জ্ঞান-বৈদ |

—ঁ * ঁ—

৩১৩ ২৩ ০ ১ ২ ৩ ১ ১
ইম ইন্দ্রায় সুস্থিরে গোমাসো দধ্যাশিরঃ

১ৱ ২ৱ ০ ২ ৩ ১ ১
তাৎ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতরে হরিভ্যাঃ
০ ২ ৩ ১
যাহোক আ ॥

• • •

স্বর্গ খনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু খনিগ্রহিত স্বর্গ মানুষের কাজে
লাগে না—যে পর্যন্ত না সেই স্বর্গ পরিষ্কৃত হয়। মানুষের হৃদয়ও
খনিবিশেষে। ইহার মধ্যে বহু মূল্যবান বস্তু নিহিত আছে। একটা
প্রবাদ-বাক্য আছে—‘যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে’। মানুষ
ভগবানেরই ক্ষুত্র সমীম প্রতিকূপ, মানুষই ‘সীমার মাঝে অসীম’। তাহার
হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তি কর্ম-শক্তি সমন্বয় আছে। প্রত্যেক কর্মের, প্রত্যেক
ভাবের বীজ মানুষের হৃদয়ে স্থপ্ত অবস্থায় নিহিত আছে। সেই ভাবকে
উপযুক্ত সাধনার দ্বারা অঙ্গুরিত ও প্রবর্দ্ধিত করিতে পারিলেই মানুষ মোক্ষ-
লাভ করিতে পারে। সেই সাধনায় প্রবর্তিত হওয়া ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ
করা ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ। ভগবান् যেমন মানুষের মধ্যের সম্ভৃতি-
সমূহের বীজ দিয়াছেন, তেমনি তিনি বীজকে রক্ষা করেন। আত্মাদিগের
হৃদয়-নিহিত সন্তানসমূহকে তিনি মলিনতা হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে
আত্মাদিগের মোক্ষসাধনলাভের উপযোগী করেন। নদীতীরের বালুকারাশির
মধ্যে স্বর্ণরেণু মিশ্রিত থাকে, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সেই বালুকারাশি হইতে
স্বর্ণরেণুর উক্তার সাধন করিয়া ও তাহাকে পরিষ্কৃত সুসংস্কৃত করিয়া মানবের

ধর্মাঙ্গারের শ্রীবৃক্ষসাধন করেন। তগবন্দ সেই বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক,—যিনি মানবের হৃদয়-সমুদ্রের সৈকতভূমিষ্ঠ স্বর্ণদপি শ্রেষ্ঠ সহস্রাবৃজীর উদ্ধার সাধন করিয়া, তাহাদিগকে স্বর্মার্জিত করিয়া, মানবকে তাহার মোক্ষ-লাভের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করেন।

* * *

তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—‘তগবন্দ ! মানুষ-জন্ম, শ্রেষ্ঠ-জন্ম বলিয়া অভিহিংত হয়। তোমার ছায়ায় নাকি মানুষ স্ফট হইয়াছে, মানুষ নাকি তোমার শ্রেষ্ঠধনের অযুক্তের অধিকাঙ্গী। এম প্রভু, যদি এমন ছল্প-জন্ম কৃপা করিয়া দিয়াছ, তবে তাহাকে সার্থক করিয়া তুল—তোমার অপার মহিমা আমাকে অনুভব করাইয়া দাও। তুমি আমাকে যে অপার্থিব সম্পৎ দিয়াছ, তাহার সম্ব্যবহার করিবার শক্তি নাই। আমার হৃদয়স্থিত অমার্জিত ভাবরাশিকে তুমি তোমার পূজাৱ উপযোগিংতা প্রদান কর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার কৃপা ব্যতীত তাহা তোমার পূজায় ব্যবহার করিতে পারি। আমার হৃদয়ে তোমার যে আলোক-রশ্মি দিয়াছ, তাহাকে ঘন-কৃষ্ণ-তমসার আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। চারিদিকের মোহ ও পাপের আবর্তে পড়িয়া তোমার দেওয়া পরমধন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে; তাহাকে নির্মল কর, উজ্জ্বল কর। হৃদয় শুক কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রেমধারা সিঞ্চন কর, শুক হৃদয় সরল হইয়া উঠুক। জ্ঞান দাও প্রভু!—যেন তোমায় জানিতে পারি। প্রেময় সর্ববসাধার তুমি—আর আমি হৃদয়ে মরুভূমিৰ সৃজন করিতেছি ! তোমার রূপধারা আমার কঠিন হৃদয়ে বর্ষিত হউক, আমি তোমাকে উপভোগ-জনিত পরমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া যাই। অনন্ত জ্ঞানময়, তোমার সন্তান কি অজ্ঞানজ্ঞয় ভূবিয়া ধাকিবে প্রভো ! ‘সত্যঃ জ্ঞানঃ অনন্তঃ’ তুমি ; দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, শুকচিত্তে বরিষ স্নেহ—এ পাপী অজ্ঞান ধন্য হইয়া যাউক।’

* * *

এই ঘন্টের প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের সাম্বিধ্যলাভের—হৃদয়ে তাহার অনুভূতিলাভের—ব্যাকুল কামনা আমরা দেখিতে পাই। সাধক চিরদিনই ভগবানের স্পর্শ প্রাপ্তে পাইবার জন্য লালায়িত ! জাগতিক কোনও সম্পদই তাহাকে তৃণ করিতে পারে না। পার্থিব মান-বশ

ধনসংপৎ তাহার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। তিনি সেই অনন্ত অপার সম্পৎ-সাগরে ভাসিয়া যাইতে যান,—যে সাগরে ভূব দিলে মানুষ অমর হয়, অমৃত হয়। সেই সম্পৎ—হৃদয়ে ভগবানের স্পর্শ। এই সাম্রিধ্য পাইবার জন্য সাধক সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। **শ্রীমন্তাগবতে** আমরা ইহার একটা উচ্চল চিত্র দেখিতে পাই। সেই অনন্তপুরমের বংশীধরনি শুনিয়া গোপীগণ আত্মহারা হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যমুনাকুলে উপস্থিত হইলেন। এখানে ভক্তের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। রাসেখর অতিশয় বিনয়ের সহিত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা ভাল ত ?” গোপীগণ এই অনাজ্ঞায়তাসূচক প্রশ্নে বিস্তৃত ক্ষুক হইলেন। সে কি ! যিনি প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা, বাঁহার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহার মুখ হইতে এই বাহু ভব্যতাসূচক প্রশ্ন ! তারপর শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে একে একে তাহাদের পার্থিব ধন মান যশ আজ্ঞায় স্বজন প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার নিকটে আসিলে পার্থিব বিষয় সব জলিয়া ছারখার হইয়া যাইবে। গোপীগণ তাহাতে জ্ঞকেপও করিলেন না। তখন তাহাদিগকে বলিলেন—‘ওহো ! তোমরা ভাবিয়াছ—আমার নিকটে আসিলে বুঝি স্বর্গভোগ করিবে ! না—তা হইবার নয় ! এই কর্মনাশ। নদী স্পর্শ করিলে স্বর্গমর্ত্ত্যের বিষয়ে আশুন ধরিয়া উঠে। সে আশা ত্যাগ কর—এখনও সংসার আছে, সম্পৎ আছে, মান আছে, যশ আছে, পরিবার-পরিজন আছে—এখনও ফিরিয়া যাও।’

* * *

কিন্তু এই সব শুনিয়াও গোপীগণ কি সত্য সত্যই ফিরিয়া গেলেন ? না। সাধক এই সব তৃচ্ছ বস্তর জন্য ঈশ্বর-সাম্রিধ্য কামনা করেন না, কাঞ্চন ক্ষেপিয়া তাহারা আচলে কাচ বাঁধেন না। তাহাদের উত্তর—‘ওগো আমি ত সে সব সম্পৎ লাভের জন্য তোমাকে প্রার্থনা করি নাই ! আমি চাই, আমার হৃদয়ে তোমার স্পর্শ। সেই পরমধনের জন্য সমস্ত ক্ষেপিয়া তোমার চরণে ছুটিয়া আসিয়াছি।’ তাই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখিতে পাই,—‘আ মদায় বজ্রহস্ত হরিভ্যাঃ যাহোক আ।’

জ্ঞান-বেদ ।

—: * : —

যে শুভা ষোরুবর্পসঃ । সুক্ষত্বাসা । রিশাদসঃ ।
— . — — —

মুরগ্নিরগ্ন । আ । গহি ॥
— — —
• • •

দেবগণ উগ্র, অথচ স্নেহপ্রবণ, তাহারা দয়ার্জ, অথচ কঠোরভাবাপন্ন। কারুণ্যের ও কাঠিল্যের, তীব্রতার ও কোমলতার,—সেখানে যেন এক অঙ্গুরী সংয়াবেশ। ইহসংসারে পিতামাতায় যুগপৎ এইরূপ কোমল-কঠোর ভাব-সমাবেশ দেখি। তাই বুবি, তাহারা সাক্ষাৎ দেবতা-রূপে পরিকল্পিত হন। পিতামাতা যেমন সন্তানের প্রতি স্বতঃস্মেহপরায়ণ, অথচ সন্তানের দুষ্কৃতিনিবারণে রুদ্রভাবাপন্ন হন; দেব-চরিত্রেও খেখানে সেই আদর্শ পরিদৃশ্যমান দেখি। দেবতা—তোমার পিতামাতা। দেখ—পিতামাতা কত স্নেহ করেন! আবার বুবিয়া দেখ—তাহারা কেন শীড়ন করেন! তুমি স্বপথে চলিলে, তাহাদের আনন্দের অবধি থাকে না। তুমি বিপথগামী হইলে, তাহারা ক্ষেত্রে আস্থাহারা হন, তোমাকে তাড়না করিতে আরম্ভ করেন। দেবতার করুণা ও ভৎসনা বিষয়েও সেই ভাব মনে করিতে হইবে।

• • •

পিতামাতা-রূপে আদর্শ হইয়া, দেবগণ সংসারে বিচরণ করিতেছেন। সমভাবে তাহাদের স্নেহ-করুণার অধিকারী হও, অপকর্ষে লিপ্ত হইয়া কদাচ তাহাদের বিরাগভাজন হইও না। সংসার-ক্ষেত্রে সাধনার ইহাই যেন প্রথম স্তর। জনক-জননীর শীতির আশ্পদ হইয়া, সংযম-শিক্ষার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে শিখিয়া, তাহাদের অনুকম্পা-লাভ-রূপ আনন্দই—ভবিষ্য-জীবনের চিদানন্দ-লাভের পথ প্রশংস করিয়া দেয়।

মরুদ্দেবগণের সমক্ষে প্রযুক্ত যে সকল বিশেষণ এই মন্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার এক একটী বিশেষণের বিষয় অনুধাবন কর ;—আর সংসারে আপনার বিচরণের পথে তাহার সার্থকতা বিচার করিয়া দেখ,—কতকটা শুভফল-লাভের আশা নিশ্চয়ই করিতে পারিবে ।

* * *

মন্ত্রের একটু ভাব-পরিগ্রহ করিয়া দেখ দেখি ! মন্ত্রে বলা হইয়াছে—
মরুদ্দেবগণ কেমন ? না—‘শুভ্রাঃ ।’ ঐ শব্দের প্রতিবাক্য সায়ণচার্য লিখিয়াছেন—‘শোভমানাঃ ।’ আমরা লিখিয়াছি—‘কলঙ্কপরিশূল্যাঃ, সৎ-
স্বরূপাঃ ।’ “শুভ্রাঃ শ্঵েতাঃ শুরসত্ত্বাবস্থাঃ ।” যিনি যেমন, তিনি তেমনটাই
চাহেন। সংসারে দেখি, যিনি উচ্চ-স্তরে অবস্থিত, তিনি সেই স্তরেরই
সামিধ্য-লাভ আশা করেন। উচ্চস্তরের জন, নিম্নস্তরে অবনমিত হইতে
কদাচ ইচ্ছুক নহেন। এখানে সেই ভাব ধারণা করুন। বলা হইয়াছে—
মরুদ্দেবগণ শুভ—কলঙ্কপরিশূল্য, শুভভাব-সমন্বিত। স্বতরাং তাহাদের মিলন,
তন্ত্রাবাপন্নের সহিতই সন্তুষ্পন্ন হয়। যাহারা বিপরীতভাবাপন্ন, কলুষ-কলঙ্ক-
পূর্ণ, পাপপরায়ণ, তাহাদের প্রতি মরুদ্দেবগণ ‘বোরবর্পসঃ’—‘উগ্রাক্রূপ-
ধরাঃ ।’ অর্থাৎ, পাপীর পক্ষে তাহারা কঠোর আসকারক : আবার, অন্য-
পক্ষে, তাহারা ‘সুক্ষত্রাসঃ’—ক্ষত্রজনোচিত সহায়স্বরূপ। ধর্মের সংরক্ষণে
এবং অধর্মের অপসারণে ক্ষত্র-বীর্য যেমন শোভনবলসম্পন্ন, ‘সুক্ষত্রাসঃ’
পদ তাহাই বক্তৃ করিতেছে। অর্থাৎ, সজ্জনের প্রতিপালন জন্য দেবগণের
শক্তি সর্বদা নিয়োজিত আছে। সজ্জনের সংরক্ষণ জন্য তাহাদের আর
এক কার্য উল্লেখযোগ্য। সে কার্য—শক্রনাশ—রিপুদমন ।

* * *

চেষ্টা কর দেখি ‘একবার—শুভ কলঙ্কপরিশূল্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার
জন্য। চেষ্টা কর দেখি একবার—সেই উগ্রত-স্তরে অধিরোহণের জন্য।
চেষ্টা কর দেখি একবার—মনে প্রাণে সন্ত্রাবাপন্ন হইবার জন্য। দেখিবে—
দেবগণ তোমাদিগের সহায় হইয়াছেন। দেখিবে—তোমাদিগের রিপুশক্র
বিমর্দিত হইয়াছে। দেখিবে—পাপীর আসকারী সজ্জনপালক দেবতারা
তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃ—

৩১২ ৭ ১১ . ৩ ২৪ ৭১২
ওঁ। সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাঠ ।

১৮ ২৪ ০ ১ ২ ০ ৯ ২ ০ ৯
স ভূমিঃ সর্বতো বৃত্তা অত্যতিষ্ঠদশাদ্বলম্ ॥
• • •

‘পুরুষঃ’ (শঙ্খবান्) ‘সহস্রশীর্ষাঃ’ (অনন্তশিরতিশুক্তঃ, অনন্তশক্তিশালী) ‘সহস্রাঙ্কঃ’ (অনন্তচক্ষুঃসবধিতঃ, অনন্তজ্ঞানসম্পন্নঃ, সর্বজ্ঞঃ) ‘সহস্রপাঠ’ (সর্বজ্ঞবিজ্ঞানঃ, সর্বব্যাপকঃ) অবতি ; ‘সঃ’ (স পুরুষঃ) ‘ভূমিঃ’ (ভূক্তাণ্ডঃ) ‘সর্বতো’ (সর্বতাবেন) ‘আ’ (সমষ্টাঃ, সর্বদিক্ষু) ‘বৃত্তা’ (পরিবেষ্ট) ‘দশাদ্বলং’ (অতিষ্ঠুত্বং হৃদেশং তথা ভূক্তাণ্ড অভীতচানং ইত্যৰ্থঃ) ‘অত্যতিষ্ঠৎ’ (অতিক্রম্য বর্জতে) । নিঃয়সত্যপ্রাপ্যাপকঃ অবং মনঃ । সর্বঃ বিদঃ শঙ্খবন্তঃ একাংশেন অবহিতঃ ; স সর্বশক্তিশালী সর্বজ্ঞঃ ইতিজ্ঞাবঃ । ০
• • •

এই মন্ত্রটি পুরুষ-সূক্তের প্রথম মন্ত্র । আক, যজুঃ, সাম, অথর্ব—চারি বেদেই পুরুষ-সূক্ত আছে । তন্মধ্যে সামবেদ-সংহিতার পুরুষ-সূক্তের পাঁচটী মন্ত্র পর-পর প্রকাশ করিতেছি । এই পাঁচটী মন্ত্র সহ, খথেদ-সংহিতার ঘোলটী মন্ত্র এবং যজুর্বেদ-সংহিতার বাইশটী মন্ত্র পুরুষসূক্তের অন্তর্গত । কিন্তু অথর্ববেদ-সংহিতায় অন্য তেজিশটী মন্ত্র পুরুষ-সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয় ।

• • •

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে এবং ইহার পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব বিরুত আছে। বিশ্বের বিশ্বনাথ কেমন ভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিষ্টমান আছেন, এই মন্ত্রে তাহাই বোধগম্য হইবে।

* * *

এই মন্ত্রের মধ্যে যে নিত্যসত্য প্রথ্যাপিত হইয়াছে, তাহার ছায়ার অনুকরণ করিয়া জগতের সকল দর্শন-শাস্ত্র ও ধর্মবিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। অনন্ত-রস্তাকর বেদজ্ঞানের ভাণ্ডারে যে সমুদয় রস্তরাজি আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, তাহাদের জ্যোতির কণামাত্র লইয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত। ধাতুর মধ্যে যেমন ‘রেডিয়াগ’, জ্ঞানভাণ্ডারে তেমনি বেদজ্ঞান। অথবা, জাগতিক কোনও বস্তুর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

* *

ভগবান् সহস্রশীর্ষ। এটা অবশ্য রূপক। ভগবানের সত্যসত্যই এক সহস্র মন্ত্রক নাই। উহা তাহার অনন্ত-শক্তির পরিচায়ক মাত্র। একজন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন—‘ভগবান্ অনন্তস্বরূপ। জগতের যত প্রাণীর মন্ত্রক আছে সমস্তই তাহার মন্ত্রক। দশ অঙ্গুলি ভূমির অর্থ—হৃদয়। তিনি বৃহৎ তইতে বৃহদ্বম, আবার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র। অতি সামান্য জীবের হৃদয়েও তিনি বর্জন আছেন।’ আমরা মনে করি, এই ব্যাখ্যায় আংশিক সত্য মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্র ইহার অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবের শ্রোতনা করে।

* *

তিনি ‘সহস্রচক্ষ’। সর্বজ্ঞব্যাপী তাহার দৃষ্টি। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, আদি অন্ত অধ্য, স্থিতি স্থিতি প্রলয়, সমস্তই তিনি দিব্যনেত্রে প্রতিযুক্ত দর্শন করিতেছেন। জগৎ তাহার জ্ঞানের মধ্যে অবশ্রিত। তিনি দেশ ও কালের উপরে। ‘দেশ’ ও ‘কাল’ * তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তাহার নিকট ‘ভূত’ নাই, ‘ভবিষ্যৎ’ নাই—একমাত্র অনন্ত ‘নিত্য-বর্তমান’ আছে। স্বতরাং সমীক্ষা জীবের পক্ষে যাহা ভূত বা ভবিষ্যৎ, তাহা তাহার অনন্তজ্ঞানে সর্বদা বর্তমান রহিয়াছে। স্বতরাং কাল তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। ‘দেশ’ তাহার সত্ত্বার অংশ মাত্র; উহা

তাহার অনন্ত সম্মানে বর্তমান আছে। তাহার নিকট 'সামীপ' অথবা 'ভূরভূ' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। স্বতরাং তিনি 'দেশের' ঘারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন। সর্বদেশে সর্বকালে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিবে ও ঘটিত্বেছে, তাহা তাহার জ্ঞানে বর্তমান আছে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে—তিনি 'সহস্রাঙ্গঃ'—সহস্রচক্ষু।

তিনি 'সৃহস্রপাঁ'। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি সর্বব্যাপক। শুধু সর্বব্যাপক নহেন, এই অঙ্গাণ তাহার মধ্যে অবস্থিত আছে এবং এই অঙ্গাণ হইতেও তিনি বৃহত্তর, মহত্তর। তিনি অঙ্গাণ হইতে দশাঙ্গুলি অধিক ভূমি ব্যাপিয়া আছেন,— এ কথার অর্থ এই যে, তিনি 'শুধু অঙ্গাণ মাত্র নহেন, তিনি তাহার অপেক্ষাও বৃহৎ ও বহু উচ্চে অবস্থিত।' দশ দিকে—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-অগ্নি-বায়ু-ঈশান-নৈঝী-উর্ক-অধঃ—এই দশ দিকে তিনি ভিন্ন অন্য আঁর কিছুই নাই। সর্বেশ্বর তিনি—সর্বরূপে সর্ববিটে সর্ববৃত্তিই তাহার বিদ্যমানতা—তিনি সর্বব্যাপক হইয়া আছেন। তাই তিনি 'সৃহস্রপাঁ'।

ভগবান् জগতে বর্তমান আছেন এবং তিনি জগদ্বীতীতও বটেন। এই উপলক্ষে পাঞ্চাত্য-দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। * পাঞ্চাত্য দার্শনিকদিগের মতে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও যুক্তিসংগত মতবাদ। এই মতবাদের পোষণকারী দার্শনিকগণ 'যুক্তিবাদী' বলিয়া অভিহিত হয়েন; এবং বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পাঞ্চত্বণ এই মতবাদেরই অনুসরণ করেন। † এই দার্শনিক মতবাদের অনুযায়ী যে ধর্মবিত্ত, তাহার নাম 'পেনেনথিজন্ম' ক্ষে অর্থাৎ ভগবান্ জগতেও আছেন, তিনি জগদ্বীতীতও বটেন। এই ধর্মবিত্তই জগতের বর্তমান ধর্মবিজ্ঞানবিং 'ধিয়োলজিয়ান' ‡ পাঞ্চত্বণ গ্রহণ করেন। স্বতরাং আমরা

* এই বজ্রে এই যে দার্শনিকমতবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাকে পাঞ্চাত্য দার্শনিকগণ Trancendent-immanent Theory বলেন।

† পাঞ্চাত্যের Rational School of Philosophy এই মতবাদের উপরই অভিন্ন।

‡ Panentheism.

§ Theologians.

ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି ଯେ, ବନ୍ଦୀମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତେ ଯେ ସକଳ ଧାର୍ଷନିକ ଓ ଧର୍ମସଂହକ୍ଷୀୟ ମତବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହିଁଯାଛେ, ତାହାର କୋନଟିଇ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ତୋ ଯାଇତେ ପାରେଇ ନାହିଁ, ଅଧିକତଃ ମେଇ ସକଳ ସଭ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ହିଁତେ ଉପରେ ହିଁଯାଛେ ।

* * *

କିନ୍ତୁ ଆଶର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି—ଅନେକେ ଏମନଇ କୁମଂକାରାଳ ଯେ, ତୀହାରା ଏମନ ଅତ୍ୟଜ୍ଞଲ ରତ୍ନରେ ଦେଖିତେ ପାନ ନା । ତାହିଁ ବେଦକେ ନିଛକ ‘ଚାସାର ଗାନ’ ବଲିତେ ତୀହାରା କୁଣ୍ଡିତ ବା ଲଙ୍ଘିତ ହନ ନାହିଁ । ଶୁଣୁ ତାହିଁ ନଥ, ବେଦର ଏହି ଅତ୍ୟଜ୍ଞଲ ଜ୍ୟୋତିଃ ସହ କରିତେ ମା ପାରିଯା, ତାହାକେ ହୀନ ପ୍ରତିପରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟାଓ ତୀହାରା କରିଯାଛେନ । ଏହି ଦଲେ ଆମାଦିଗେର ଦେଶେର ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ଆଛେନ ! କେହ କେହ ବେଦଜ୍ଞାନକେ ‘ପେଣ୍ଟେଇଜମ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ୍ ବିଶେଇ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ବିଶ୍ଵାତୀତ ତୀହାର କୋନରେ ସନ୍ତା ନାହିଁ ବଲିଯାଛେନ । ଚୋଥେ ରଙ୍ଗିନ ଚଶମା ପରିଲେ ସମସ୍ତରେ ରଙ୍ଗିନ ଦେଖାୟ । ହୃତରାଂ ତୀହାରା ଯେ ଆପନ .ଆପନ ଇଚ୍ଛାମୂଳକ ମତବାଦ ବେଦର ମଧ୍ୟେ ଦେଖିତେ ପାଇବେ, ତାହା ଆର ଆଶର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବିଷୟ ନହେ । କିନ୍ତୁ ଏକଙ୍କନ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ (ପ୍ରକ୍ଷେମାର ମ୍ୟାନ୍‌ମୂଳାର) ଏହି ସକଳ ହୀନ-ଚେଷ୍ଟାର ତୀତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଯା ବଲିଯାଛେନ ଯେ, ବେଦେ ଯେ ଧର୍ମମତେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ହିଁଯାଛେ, ତାହା ‘ପେଣ୍ଟେଇଜମ’ * ନଥ, ତାହା ‘ପେନେନ୍‌ଥିଜମ’†— ଧର୍ମ-ଜଗତେର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତବାଦ । ଆଜ ଓ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉପର ବେଦ କିଳିପ ପ୍ରତାବ ବିଜ୍ଞାର କରିଯାଛେନ ଏବଂ ବେଦଜ୍ଞାନଇ ଯେ ଜଗତେର ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନେର ଜନକ, ତାହା ପ୍ରଦଶନ କରିବାର ଜନ୍ମିତ ଏତ ଆଲୋଚନା କରିତେ ହିଲ । ବନ୍ଦୀମାନ ଜଗନ୍ନ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଅଛୁ ଲିଖିଯା ଶତାବ୍ଦୀର ପର ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିଯା ତର୍କ-ବିତର୍କ କ୍ଷେତ୍ରିଯୀ ଯେ ସିଦ୍ଧୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପନୀତ ହିଁତେ ପାରେ ନାହିଁ, ବେଦ ଏକଟୀ ମନ୍ତ୍ରେ ମଧ୍ୟେ କେମନ ହୃଦୟରଭାବେ ତୀହାର ମୀମାଂସା କରିଯା ଦିଲାଛେ ।

* Pantheism.

† Panentheism.

জ্ঞান-বেদ !

—ঃঃ ॥ ৩ ॥

০ ২ ৩ ২ ৭ ০ ১ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২ ৬ ১ ২
ত্রিপাদুর্ক্ষ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহম্যেহাত্মবৎ পুনঃ ।

২ ০ ২ ৩ ৫ ২ ৮ ০ ১ ২ ৩ ২
তথা বিষঙ্গ ব্যক্তামৃৎ অশনানশনে অভি ॥

• • •

‘পুরুষঃ’ (ভগবান्) ‘ত্রিপাদ উর্ক্ষঃ’ (ত্রিশণং অতিক্রম্য, ত্রিশণাভীতঃ সন्) ‘উদৈৎ’ (তিষ্ঠতি, বর্ততে) ; ‘পুনঃ’ (অপিচ) ‘অস্ত’ (অস্ত, ভগবতঃ) ‘গামঃ’ (অংশঃ) ‘ইহ’ (অগতি, জিখণাদ্বাকে অগতি ইত্যৰ্থঃ) ‘অত্মবৎ’ (বর্ততে) ; ‘তথা’ (চ) সঃ ‘অশনানশনে’ (অশনং তথা অনশনং, তোজনাদিব্যাপারযুতং সচেতনং তথা তদ্বিহিতং অচেতনং, সর্বং সৃষ্টিবস্তু ইত্যৰ্থঃ) ‘অভি’ (অভিলক্ষ্য, অধিক্রত্য) ‘বিষঙ্গ’ (সর্বং বিষৎ) ‘ত্রিপাদুর্ক্ষ’ (ব্যাপোতি, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি) . নিত্যসত্যপ্রথ্যাপকঃ অযং মন্ত্রঃ । ভগবৎসত্তা বিহে অহুষ্যতা অবৃত্তি, অপিচ ভগবান্ বিষৎ অতিক্রম্য অপি বর্ততে—ইতি তাৰঃ ।

• • •

এই মন্ত্রটা—পুরুষ-সূক্ষ্মের বিতীয় মন্ত্র । এই মন্ত্রও অয় বেদে পরিদৃষ্ট হয় । ভগবান্ কি ভাবে কোথায় বিশ্বমান আছেন, এই মন্ত্রে তাহারই একটা আভাস পাওয়া যায় ।

• • •

ভগবান् ত্রিগুণাত্মকও বটেন; ত্রিগুণাত্মিতও বটেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে অনুষ্যুত আছেন। এই বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক; স্ফূর্তরাঃ এই দিক দিয়া তিনিও ত্রিগুণাত্মক। যাহা কিছু আছে বা হইবে, সমস্তই তিনি—‘সর্বং খর্ষিদং ব্রহ্ম’—এই বিশ্ব তাঁহারই একাশ। সত্ত্ব-রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের সমবায়ে জগৎ স্থৃত হইয়াছে। যখন ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন অলস হয়। সমস্ত বিশ্ব ভগবানে লীন হয়—তিনি তখন আপনাতে আপনি বর্তমান থাকেন; তখন তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব মাত্র হয়েন। * তাঁই মন্ত্রে তাঁহার ক্রিয়াশীল এবং নিক্ষিয় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার এক পদ জগতে বর্তমান থাকে; অর্থাৎ তিনি তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ স্থিতি করেন। তিনি ও তাঁহার মায়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে এক নহে। যে অংশ ত্রিগুণাত্মিত, মায়াত্মিত, তাহা তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বা †; ত্রিগুণাত্মিকা যে মায়াশক্তি ‡, তাহাই জগৎ স্থিতির ব্যাপারে নিযুক্ত হয়।

* * *

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। মানুষ সমীম, ভগবান् অসীম। স্ফূর্তরাঃ সমীম মানুষ তাঁহার সাম্ন ভাব ও ভাষার দ্বারা সেই অসীম অনন্তকে একাশ করিতে পারে না। মানুষের মেশক্তি নাই। যখন মানুষ নিজে অনন্ত হয়, সীমার উর্দ্ধে গমন করে, তখনই মেশেই অসীম অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারে; কিন্তু তাহা জগতে একাশ করিবার ভাষা তাঁহার নাই। স্ফূর্তরাঃ অসম্পূর্ণ ভাষার দ্বারা তাঁহাকে আংশিক ভাবে একাশ করা যায় মাত্র। মানুষের ভাব ও ভাষার এই দৈন্য মনে রাখিয়া আমাদিগকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ‘তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা অংশ’, ‘ত্রিগুণাত্মিত অংশ’ প্রভৃতি ভাষা আমরা ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উহা আমাদিগের ভাষার দৈন্য ‘মাত্র’। প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিঃ অসীম। তাঁহার অংশ নাই, তাঁহাকে বিভক্ত করা যায় না। তাঁহার শক্তি প্রথ্যাপন করিবার জন্য আমাদিগকে শতদেন্ত্য সর্বেও এই ভাষারই সাহায্য লইতে

* পাঞ্চাত্য ধার্মনিকের ভাষা—“When the forces are at equilibrium.”

† পাঞ্চাত্য-বচ্ছেদ—“Pure Existence.”

‡ পাঞ্চাত্য-বচ্ছেদ—“Creative Energy.”

হইবে। শতরাং ভাষার শব্দার্থ ধরিয়া বিচার করিলে চলিবে না,—শব্দের পশ্চাতে যে বহুগুণে উচ্চ ভাব রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

* . *

এই উপলক্ষে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা টাপ্পনীতে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী প্রতিশব্দ বা ইংরেজী অর্থ ব্যবহার করিতেছি। তাহার প্রধান কারণ এই যে, অনেকেই হিন্দু-দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য-দর্শনের মিলন করিতে অসমর্থ হয়েন; অথচ পাশ্চাত্য ভাব-প্রবাহের মধ্য দিয়াই তাহারা শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। লজ্জার বিষয় হইলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, এই শিক্ষা দীক্ষার সহিত প্রাচ্য ভাব-ধারার সংযোগ-সাধনের কোনও চেষ্টা দেখা যায় না। তাই পাশ্চাত্যতাবে শিক্ষিত ভারতবাসী, ভারতীয় সংস্কৃতা বুঝিতে পারেন না। তাহাদিগের স্ববিধার জন্যই ভারতীয় দর্শনে ব্যবহৃত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ স্থানে স্থানে টাপ্পনীতে প্রকাশ করিয়াছি।

* . *

এখন আবার মন্ত্রার্থ-সমস্তে আলোচনা করা যাউক। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে ‘তিনি চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুতে বর্তমান আছেন।’ এখানে ‘চেতন অচেতন’ বলায় বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অচেতন বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; কারণ, সমগ্র বিশ্বে সেই অনন্তচেতনসত্তা বিন্দুমান আছেন। গাছে, পাথরে, ধূলিকণাতেও যে চৈতন্ত্য বর্তমান—সেই চৈতন্ত্য অবিনাশী অক্ষয়। উহা শুধু ধর্মতত্ত্বের মীমাংসা নয়। সেই প্রাচীন বেদজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া বর্তমান জগতের পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানানুমোদিত পছাড় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানগম্য যন্ত্রপাতির সাহায্যেও এই মহাসত্য প্রমাণিত হইতেছে। সেই চৈতন্ত্যসত্তা সর্বত্র সর্বকালে বর্তমান আছেন; তাই ভগবদ্বাক্যে উচ্চ হইয়াছে—“বিষ্টভ্যাহমিদং
কৃৎস্নমেকাংশেন প্রিতং জগৎ।”

— • —

ଓଡ଼ିଆ-ବେଦ ।

—ଫୁ # ଫୁ—

୧୨ ୩୨୯ ୩ ୨ ୩୨୯ ୩ ୧୧
ପୁରୁଷ ଏବେଦଃ, ସର୍ବଃ ଯତ୍, ଭୂତଃ ସଞ୍ଚ ଭାବ୍ୟମ୍ ।

୧୨ ୩ ୧୦ ୩୧ ୧ ୩୧୨୭ ୧୨ ୩୨
ପାଦୋହମ୍ୟ ସର୍ବା ଭୂତାନି ତ୍ରିପାଦମ୍ୟାଘୃତଃ ଦିବି ॥

* * *

‘ପୁରୁଷ’ (ଉତ୍ତରାନ୍) ‘ଏବ’ (ହି) ‘ଯତ୍ ଭୂତଃ’ (ଉତ୍ତରାନ୍, ଅଗ୍ନଃ) ‘ଚ’ (ତଥା) ଯତ୍ ‘ଭାବ୍ୟ’
(ଉତ୍ତରାନ୍, ଅମୁଲପରାନ୍, ଜଗବତି ବର୍ତ୍ତମାନଃ, କାରଣାବହ୍ଵାରାନ୍ ଶୀନଃ ଇତ୍ୟାର୍ଥଃ) ‘ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଃ’
(ସର୍ବଃ ବିଶ୍ୱଃ) ତଥାତି—ଇତି ଶେଷଃ ; ‘ସର୍ବା’ (ସର୍ବାନି) ‘ଭୂତାନି’ (ଉତ୍ତରାନି, ସର୍ବାନି)
‘ଅତ୍’ (ଉତ୍ତରାନ୍, ତଥଃ) ; ‘ତ୍ରିପାଦ’ (ତ୍ରୟ, ଅଂଶଃ, ତ୍ରିଶାଖାବକଃ) ‘ପାଦଃ’ (ଅଂଶଃ) ତଥାତି
ଇତି ଶେଷଃ ; ତଥା ‘ଅତ୍’ (ଉତ୍ତରାନ୍, ତଥଃ) ‘ଅମୃତଃ’ (ଅମୃତବରପଠ, ତ୍ରିଶାଖାବକଃ
ଅଂଶଃ ଇତ୍ୟାର୍ଥଃ) ‘ଦିବି’ (ଶ୍ରୋତନାଙ୍କରେ ସମ୍ରକାଶେ, ସମ୍ରକପେ) ତିର୍ତ୍ତତି ଇତି ଶେଷଃ । ମଞ୍ଜୋହରୀ
ନିତ୍ୟମତ୍ୟମୂଳକଃ । ବିଶ୍ୱଃ ଉତ୍ତରାନ୍ ଆଂଶିକଃ ପ୍ରକାଶଃ ତଥାତି—ଇତି ଭାବଃ ।

* * *

ଏହିଟି—ପୁରୁଷ-ସୂଜ୍ଞର ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର । ବିଶ୍ୱର ମହିତ ବିଶ୍ୱମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରରେ
ବିଷୟ ଭାବାନ୍ତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ଲଙ୍ଘ କରନ ।

* * *

বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। এই জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত আছে। জগতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্তই তাঁহা হইতে আসিয়াছে এবং যাহা উৎপন্ন হইবে, তাঁহাও সেই ভগবান् হইতে আসিবে। কারণ, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না! প্রকাশমান জগৎ তো তাঁহারই প্রকাশ। তাহা ব্যতীত ভবিষ্যৎ জগৎও তাঁহাতে কারণাবস্থায় * বস্ত্রমান আছে। তিনি জগতের মূলকারণ। স্মষ্টির পূর্বে জগৎ তাঁহাতেই ছিল, এবং প্রলয়ের পরেও তাঁহাতেই থাকিবে! সেই আদি কারণ হইতে জগৎ ‘কার্য্যরূপে’ † প্রকাশিত হয়। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতে ‘কার্য্যকারণাত্মেদ’ ‡ এই দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতেও এই মতবাদ সামনে গৃহীত হইয়াছে। চৈতন্যবাদী § দার্শনিকদিগের মতে বিশ্বের মধ্য দিয়া ভগবানই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। শুধু তাই নয়। তিনি কেবলমাত্র বিশ্বেই পূর্ণবস্তি নহেন। বিশ্বাতিরিক্ত তাঁহার অযুতময় সন্তা আছে। তিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। ক্রিয়শীল হইলে ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তিপ্রভাবে জগৎ স্মষ্টি করেন; আবার, প্রলয়কালে আজ্ঞালীন হইয়া অবস্থিত থাকেন। দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মের এই শেষোক্ত অবস্থাকে ‘কুটুম্ব লক্ষণ’ বলা হইয়াছে। স্মষ্টি হিতি প্রলয়—তাঁহার মহিমার তুলনায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাঁহার ইঙ্গিতে মহাপ্রলয় মুহূর্তের মধ্যে সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাই তাঁহার মহিমার শেষ নয়। তিনি অযুতস্বরূপ,—তাঁহার সন্তানগণকেও তিনি অযুতস্ব প্রদান করেন। তিনি জগৎ, তিনি জগদ্বীত, তিনি ত্রিগুণাত্মক, তিনি ত্রিগুণাতীত। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

* * *

* পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায়—“In casual state.”

† পাশ্চাত্য-মতে—“As effect.”

‡ পাশ্চাত্য-মতে—“Nondifference of cause and effect.”

§ চৈতন্যবাদী (Idealist); ইহাদের মত,—The Eternal Idea is realising itself in and through the universe.

জ্ঞান-বেদ ।

୩୨୯ ୭ ୧ ୨ ୨
ତାବାନ ଅଶ୍ଵ ମହିମା ତଡୋ ଜ୍ୟାମାତ୍ରଚ ପୁରୁଷः ।
୦ ୧ ୨୦୧ ୨ୱ ୩ ୧ୱ ୨ୱ ୦ ୧୨
ଉତ୍ତ ଅଗ୍ନତତ୍ସ୍ଵ ଈଶାନୋ ସ୍ଵ - ଅମ୍ବେନ ଅତିରୋହତି ॥

‘तावान्’ (भृत्यविश्वृ-वर्तमानक्रपेण अवस्थितानि उग्रस्मृतिक्रपकर्माणि) ‘अन्त’ (उग्रवतः) ‘महिमा’ (सामर्थ्यं—विशेषं इति शब्दं) उवति इति शेषः ; ‘च’ (त्रु) ‘पूर्वः’ (उपवान्) ‘उत्तः’ (अन्तः महिमाग्राः) अपि ‘अज्ञान्’ (अतिश्वेषं अधिकः, महस्त्रः) उवति इति शेषः ; ‘उत्त’ (अपिच) ‘यद्’ (यः) अप्नेन (शक्त्या, वशक्त्या) ‘अतिरोहति’ (अतिक्रामति,—विश्वं इति शब्दं) सः उग्रवान् एव ‘अमृतस्तु’ (अमृतस्तु) ‘जीवानः’ (अधीर्षतः, अदाता इत्यर्थः) उवति इति शेषः । नित्यसत्यप्रथापकः अयं मत्तः । अमृतआपकः उग्रवान् अनीव-भक्तिसम्पन्नः उवति ; तस्मि महिमाग्राः एकांश्वं एव विश्वक्रपेण आचृत्यवति—इति ज्ञावः ।

এই মন্ত্র—পুরুষ-সূক্ষ্মের চতুর্থ মন্ত্র। সেই পুরুষ—ভগবানই যে মুক্তিদাতা, এই মন্ত্র তাহাই প্রধ্যাত হইয়াছে।

তগবান্তকৃপাপক—তিনি অমৃতের অধীশ্বর। তাহার কৃপাতেই
মানুষ অমৃতস্থ লাভ করে। • সৃষ্টি—এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি—তাহারই
খেলা; আবার এই ত্রিগুণের বেড়াজালের মধ্য হইতে মানুষকে বাহির
করিয়া তাহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দেওয়াও তাহারই খেলা। মানুষ এই
অমৃতের আশাতেই চাতকের গত তাহার পানে চাহিয়া থাকে। এক-
কেঁটা অমৃতবর্ষণে মানুষের অনন্ত পিপাসা চিরতরে নিরুত্ত হইয়া যায়।
তাহার এই মুক্তিদায়ক মৃত্তিই এই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে ॥

জ্ঞান-বেদ !

—ঃঃ * ঃঃ—

১ ২ ২১২ . ৩২ ৩ ২ ৩ ১২
ততো বিরাট্ অজায়ত বিরাজো অংধি পুরুষঃ ।
৩ ২ ৩ ১ৱ ২ৱ ৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ২
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাত্ ভূমিৎ অথঃ পুরঃ ॥

‘ততঃ’ (তত্ত্বাত্মক আদিপুরুষাত্ম) ‘বিরাট্’ (পরমাত্মাত্মিক্রমঃ, ব্রহ্মাণ্ডমেহঃ) ‘অবাস্ত’ (উৎপন্ন ত্বতি) ; ‘বিরাজঃ অধি’ (বিরাজভেহত্তোপনি ব্রহ্মাণ্ডমেহ) ‘পুরুষঃ’ (আত্মা) উৎপন্নঃ ত্বতি ইতি ষাবৎ । পরমাত্মা বিশ্বাত্মকপেণ ব্রহ্মাণ্ডমেহে অবিশতি ইত্যর্থঃ । ‘সঃ জাতঃ’ (সঃ বিরাটপুরুষঃ) ‘অত্যরিচ্যতে’ (অত্যরিক্তঃ ত্বতি, দেবতিত্যুম্ভুষ্যাদিক্রমঃ ত্বতি ইত্যর্থঃ) ; ‘পশ্চাত্’ (ততঃ) ‘ভূমিৎ’ (পৃথিবীঃ) স্মৃতি ইতি ষাবৎ ; ‘অথঃ’ (অনন্তরঃ) ‘পুরঃ’ (জীবাত্মাত্মাত্মক্রান্ত—মেহঃ) স্মৃতি ঈতি শ্রেষ্ঠঃ । অত মন্ত্রে স্মৃতিক্রমঃ বিবৃতঃ, তগ্নতঃ হি সর্বং অগ্রং উৎপন্নং—ইতি তাৰঃ ।

* * *

এই মন্ত্রটি—পুরুষসূত্রের পঞ্চম মন্ত্রস্তু, এই মন্ত্রে স্মৃতিক্রম বর্ণিত হইয়াছে । মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা বর্তমান কাল ব্যবহার করিয়াছি । তাহার কারণ এই যে, তগবানের নিকট সমস্ত কালই নিত্য বর্তমান । অনন্তের দিক দিয়া একমাত্র বর্তমান ব্যতীত অন্য কাল নাই । *

* পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে—From the standpoint of Eternity—sub-specie eternitatis.

স্মষ্টি ও প্রলয় প্রতি মুহূর্তেই সংজ্ঞাচিত হইতেছে। স্মষ্টিক্রমও অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। তাই আমরা বর্তমান কাল ব্যবহার করিয়াছি।

* * *

মেই পরমপুরুষ তত্ত্বান্ত আপনার মহিমায় অবস্থিত আছেন। তাহার ইচ্ছায় প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ—এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। এই বিশ্বের মধ্যে তাহার চৈতন্যশক্তি প্রবেশ করে। তাহা হইতে ক্রমশঃ দ্যুলোক ভূলোক স্থাবর জগত সমন্ব উৎপন্ন হয়। স্বতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই বিশ্ব তাহারই বিকাশ মাত্র। এই বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতেও তাহার শক্তি বর্তমান রহিয়াছে। *

* * *

* কি তাবে তিনি বিশ্বে উৎপন্নোত্তঃ বিষ্ঠমান রহিয়াছেন, পুরুষস্মকের অবশিষ্ট করেকটী মন্ত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সে সকল মন্ত্রের বিশ্লেষণে স্মষ্টির ক্রম-বিষয়ে একটা ধারণা অয়ে। মহুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে মার্শনিক সম্প্রদারের মধ্যে অধ্যয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত আছে, তাহার মূল-তত্ত্ব এই পুরুষস্মকে অবগত হইতে পাওয়া যায়; এবং অগতে যে আতি বর্ণ ও কর্ম-বিভাগ প্রভৃতি পরিসৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা অয়ে। মেই সকল মন্ত্রের অর্থ উপলক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদারের মধ্যে বিভিন্নরূপ বিচার-বিতঙ্গ আছে। দৃষ্টান্ত অনুসর তাহার ধার একটা মন্ত্র নিম্নে উন্নত করিতেছি। যথা,—

। । । ।
“ত্রাঙ্গণোহন্ত সুখমাসীং বাহ রাজত কৃতঃ।
— — —

। । ।
উক তমস্ত বৈষ্ণবঃ পত্যাং শুঙ্গো অদারত ॥”
— — —

এই মন্ত্র উৎপন্নোত্ত, এক প্রেমীর সামাজিকগণ আচীনকালে যে আতিতেজ-প্রথা বিষ্ঠমান হিল, তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োগ প্রস্তুত; অন্ত প্রেমীর সামাজিকগণ পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র বলিয়া এই বজ্রটাকে পরিহার করিতে চাহেন।

অধর্মবেদে এই সকল মন্ত্রই সামাজিক পরিবর্ত্তিকালে যে আতিতেজ-প্রথা বিষ্ঠমান হিল, তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োগ প্রস্তুত; অন্ত প্রেমীর সামাজিকগণ পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র বলিয়া এই বজ্রটাকে পরিহার করিতে চাহেন।

জ্ঞান-বেদ ।

—ঃঃ * ঃ—

নমো মহত্ত্বোঁ নমোঁ অর্জকেভোঁ

নমো যুবভোঁ মম আশিনেভ্যঃ ।

যজাম দেবান् যদি শক্রবাম

মা জ্যামসঃ শংসমায়কি দেবাঃ ॥

‘মহত্ত্বঃ’ (অসিদ্ধেভঃ দেবেভঃ) ‘মমঃ’ (অগতোহশ্চি) ; ‘অর্জকেভঃ’ (অপ্রিসিদ্ধেভঃ, কুদ্রেভঃ দেবেভাঃ) ‘নমঃ’ (অগতোহশ্চি) ; ‘যুবভাঃ’ (তক্ষণেভঃ, নবপ্রিসিদ্ধিম্পরেভঃ দেবেভঃ) ‘নমঃ’ (অগতোহশ্চি) ; ‘আশিনেভ্যঃ’ (বৃক্ষেভঃ, সুর্যগৌরবেভঃ দেবেভঃ) ‘নমঃ’ (অগতোহশ্চি) ; ‘যদি শক্রবাম’ (যদি সমর্থী শক্রবাম, যাবৎ অশক্ত ন তৃত্যাম) ‘দেবান্’ (সর্বানু লৌকিকানামি শুণবিশিষ্টানু) ‘যজাম’ (যজ্ঞামতে, যজ্ঞামহে) ; ‘দেবাঃ’ (হে দেব-নিবহাঃ) ‘জ্যামসঃ’ (জ্যোতিষ্ঠ, যথধিকশুণসম্পর্কত, পূর্ণাহস্ত দেবস্ত) ‘শংসঃ’ (শাকঃ, পুরাণঃ) ‘আ’ (সর্বতোভাবেন) ‘মা বুকি’ (অহং বিছন্নঃ মা কার্য্যঃ) । হে তপ্যন্তি সর্বেভোঁ দেবেভঃ পুরাণাং সমাতুল্যাগং অবিচলং কুল ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ।

* * *

হে সর্বেশ্বর ! হে সর্বময় ! তুমি তো সর্বত্ব সর্বঘটে বিরাজমান !
কোনু দেবতায় তুমি নাই ? সকল দেবতাই তো তোমার বিভূতি ! তবে
কেন বিজ্ঞ আসে ? তবে কেন দেব-ভাবে দেখি ? তবে কেন দেবতায়

ଶୁଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ନୀଚ ମହେ ଗୁଣେର ନୂନାଧିକ୍ୟ କଲନା କରି ? ‘ଅମୁକ ଦେବତା ବଡ଼’, ‘ଅମୁକ ଦେବତା ଛୋଟ’, ‘ଅମୁକ ଦେବତାଯ ଗୁଣେ ଆଧିକ୍ୟ ଆଛେ’, ‘ଅମୁକ ଦେବତାଯ ଗୁଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ଦେଖିତେଛି’, ‘ଅମୁକ ଦେବତା ବୃଦ୍ଧ ମାହାୟଶୁଣ୍ୟ ହଇଯାଛେ’, ‘ଅମୁକ ଦେବତା ନୈନ ଜାଗ୍ରେ ହଇଯା ଉଠିଯାଛେ’,—ଏ ସକଳ ଚିନ୍ତା କେନ ମନେ ଆସେ ? ଏ ସକଳ ଅତି ନୀଚ-କଲନା-ମୂଳକ । ତୀହାର ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନୋଷ୍ଟେ ହଇଯାଛେ, ଯିନି ସାଧନାର ଏକଟୁ ଉଚ୍ଚତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିତେ ପାରିଯାଛେ, ତିନି କଥନଇ ଦେବତାର ମଧ୍ୟେ ଇତର-ବିଶେଷ ଶୁଦ୍ଧ-ମହେ ଦେଖିତେ ପାନ ନା ; ତୀହାର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେବତା ସକଳଇ ସମାନ,—ସକଳଇ ଅଭିନ୍ନ । ତାଇ ତିନି କୋନଓ ‘ଦେବତାକେ ଛୋଟ ଭାବିଯା ଉପେକ୍ଷାର ଚକ୍ଷ ଦେଖେନ ନା, ଅଥବା କୋନଓ ଦେବତାକେ ଅଶ୍ୟ ଦେବତା ଅପେକ୍ଷା ତୁଳନାଯି ‘ବଡ଼’ ଭାବିଯା ତୀହାର ପୂଜାର ଜୟ ଅଧିକର୍ତ୍ତର ଆୟୋଜନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହନ ନା । ଦେବତାର ସମସ୍ତେ କୋନଙ୍କପ ତର-ତର-ଭାବ ସାଧକେର ହଦୟେ ଆର୍ଦ୍ଦୀ ଶାନ ପାଇ ନା । ସକଳ ଦେବତାର ଚରଣେଇ ତିନି ସମାନ ଭକ୍ତିଭରେ ପ୍ରଗତ ହନ,—ସକଳ ଦେବଭାବକେଇ ତିନି ଧ୍ୟାନ-ଧାରଣାର ସାମଞ୍ଜ୍ଞୀ ବଲିଯା ମନେ କରେନ ।

* * *

ସତକ୍ଷଣ ସାମର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଧାକିବେ, ତତକ୍ଷଣ ଯେନ ଐ ଭାବେର ବ୍ୟତ୍ୟୟ ନା ହ୍ୟ । ଜୀବ ଧାକିତେ, ସଂଜ୍ଞା ଧାକିତେ ଆମରା ଯେନ କୋନଓ ଦେବତାକେ ଭେଦଭାବେ ଦର୍ଶନ ନା କରି ! ଧନୀ ତୁମି ; ଦେବାରାଧନାୟ ଧନେର ସମ୍ବ୍ୟବହାର କରିତେ ଚାଓ ? ସକଳ ଦେବତାର ଅତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିତେ ପୂଜାୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋ । ତୁମି ଶାକ—ଶକ୍ତିର ଉପାସକ ; ତୋମାର ଅତିବାସୀ ଶିବ—ଶିବେର ଉପାସକ । ତାଇ, ତୋମାଦେଇ ହୁଇ ଜନେର ମଧ୍ୟେ କି ହନ୍ତିହି ନା ଚଲିଯାଛେ ! କିନ୍ତୁ ଶିବ-ଶକ୍ତି କି ଭିନ୍ନ ? ଆନ୍ତ ! କେନ ତୋମାର ଏ ବିଭ୍ରମ ଆସେ ? ବୈଷ୍ଣବେର ଉପାସ୍ତ-ଦେବତା ବିହୁର ପ୍ରତିଇ ବାକେନ୍ତ, ହେ ଶାକ, ତୋମାର ବିରାଗ-ଭାବ ଦେଖି ? ଆବାର ବୈଷ୍ଣବହି ବା କେନ, ତୋମାର ଇଷ୍ଟଦେବତା କାଳୀତାରା-ମହାବିଷ୍ଣାର ନାମ-ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁରେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଲି ପ୍ରଦାନ କରେନ ? ହିମ୍ବ ମୁସଲମାନ-ଖୁଟ୍ଟାନ-ପାରମୀ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଳୟୀର ମଧ୍ୟେ ଏ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ-ବିତଣ୍ଣାର ତୋ ଅବଧିହି ନାହିଁ ! ପରମ୍ପରା ଏକ ଏକ ଧର୍ମ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାର ମଧ୍ୟେଓ କତ ହନ୍ତିହି ଦେଖିତେ ପାଇ । ଖୁଟ୍ଟାନେର ରୋମାନ-କ୍ୟାଥଲିକ ଓ ପ୍ରଟେକ୍ଟାନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ମଧ୍ୟେ, ମୁସଲମାନ-ଦିଗେର ସିଙ୍ଗା ଓ ଶୁନ୍ନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଘରେର ମଧ୍ୟେ, କତକାଳ ଧରିଯା କି ଶୋଣିତ-

ଆବୀ ସନ୍ଦ ଚଲିଯାଛିଲ, ଅତୀତ-ସାକ୍ଷୀ ଇତିହାସେର ଅଙ୍ଗେ ତାହା ଭୌଷଣ ରଜ୍ଞ-
ବର୍ଣେ ରଞ୍ଜିତ ରହିଯାଛେ—ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତି ! ଶାକ୍ତ-ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସନ୍ଦ ଆଜିଓ
ହିନ୍ଦୁମାତ୍ରକେ କଲକ-କଲୁଷିତ କରିଯା ରାଖେ ନାହିଁ କି ? ହିନ୍ଦୁର ସହିତ
ବୌଦ୍ଧଦିଗେର, ଆବାର ବୌଦ୍ଧଗଣେର ସହିତ ଜୈନଦିଗେର କି ଭୌଷଣ ସନ୍ଦିଇ
ଚଲିଯାଛିଲ ! ଆନ୍ତ ତେବେ-ବୁଦ୍ଧିଟ ସକଳ ବିତଣୀର ମୂଳୀଭୂତ ନହେ କି ?
ମନ୍ତ୍ର ବଲିତେଛେନ,—ଭଗବାନ୍ କହିତେଛେନ,—‘ତେବେ-ବୁଦ୍ଧି ପରିହାର କର ।
ସତକ୍ଷଣ ଜୀବର ଆଛେ, ସତକ୍ଷଣ ସାର୍ଥ୍ୟ ପାଓ, ସକଳ ଦେବତାକେ—ସକଳ
ଦେବଭାବକେ—ଭଗବାନେର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନିକେ—ଅଭିନଭାବେ ଦର୍ଶନ କର,—
ଏକ ଭାବିଯା ପୂଜା କରିତେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ହୋ ।’

* * *

ମନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଉପଦେଶ,—ତୁମି ସକଳ ଦେବତାକେ ସମାନ ଭଜିସହକାରେ
ସହୋଦନ କରିଯା ଆର୍ଥନା ଜାନାଓ,—‘ହେ ଦେବଗଣ ! ଆମାର ମତିଗତି-ପ୍ରବୃତ୍ତି
ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କରିଯା ଦେଓ । ଆମି ଯେନ ସକଳ ଦେବତାକେ ଅଭିନ୍ନ-ଦୃଷ୍ଟିତେ
ଦର୍ଶନ କରିତେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ! ଆମାର ହନ୍ଦୟେ ଯେନ ସଂସାରେ ସକଳ ଦେବତାର
ପ୍ରତି ସର୍ବିର୍ଥା ସମାନ ଅନୁରାଗ ସଞ୍ଚାତ ହୁଏ । କୋନ୍ତା ଦେବତାର ପୂଜା-ଅର୍ଚନାଯ
ଯେନ ଆମାର ବିରକ୍ତି ନା ଘଟେ,—ବିରକ୍ତି ନା ଆସେ । କୋନ୍ତା ଦେବତାର ସହିତ
ଯେନ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚିନ୍ମ ନା ହୁଏ—ସକଳ ଦେବତାର ସର୍ବରୂପ ଦେବଭାବେ
ଆମାର ଅନ୍ତର ଯେନ ସଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକେ । ସର୍ବଦେବତାଯ ସମଦର୍ଶନ, ସକଳ
ପ୍ରକାର ଦେବଭାବେର ବିକାଶ—ଯେନ ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ; ହେ ଦେବଗଣ, ତାହାଇ
ବିହିତ କରନ୍ତି । ବଲା ବାହ୍ଲ୍ୟ, ଏହି ଭାବଇ ସାଧନାର ପ୍ରକଟ ଭାବ,— ଏହି
ଅବସ୍ଥାଇ ସାଧକେର ପରମ ଶ୍ରେସ୍ତଃ ଅବସ୍ଥା । ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାର ପୂଜାଯ ପ୍ରବୃତ୍ତ
ହିତେ ହିତେ, ଉଚ୍ଚାବଚ ଶ୍ଵରଗତ ଦେବତାର ଆର୍ଥନାଯ ଅଭିନ୍ନ ହିତେ
ହିତେ, ତର-ତମ ପ୍ରଭୃତି ଭାବେର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୈତ୍ୟଗଣେର ସକାଳ ଲାଇତେ ଲାଇତେ
ମାନୁଷ ଶେଷେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଯିଇ ଉପନୀତ ହୁଏ । ଅଗ୍ରସର ହିତେ ହିତେ, ଜ୍ଞାନେଇ
ଭେଦଭାବ ଦୂରେ ଚଲିଯା ଯାଏ । ଶେଷେ ତାହାର ଆତ୍ମୋବୋଧ ହୁଏ ; ଜ୍ଞାନୋକ୍ଷେଷେର
ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ଦେବଦ୍ୱାରର ପ୍ରଣତ ହିଲ୍ଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାଇବାର ଅଧିକାର ଆସେ,—

“ନମୋ ମହନ୍ତ୍ୟୋ ନମୋ ଅର୍କକେତ୍ୟୋ ନମୋ ମୁବତ୍ୟୋ ନମୋ ଆଶିନେତ୍ୟଃ ।

ସଜାମ ଦେବାନ୍ ଯଦି ଶକ୍ତିବାମ ମା ଜ୍ୟାୟମଃ ଶଂସମାର୍ଦ୍ଧି ଦେବାଃ ॥”

* . *

ଖ୍ୟାତିକୁମାର ଶୁନଃଶେପେର ସେ ଉପାର୍ଥ୍ୟାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଏହି ମନ୍ତ୍ରେର ଏବଂ ଇହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କତକଗୁଲି ମନ୍ତ୍ରେର ପ୍ରସ୍ତରନାର ବିଷୟ ଭାଷ୍ୟକାରଗଣ ଧ୍ୟାପନ କରିଯା ଆସିତେଛେ; ସେ ଦିକ୍ ଦିଯା ଦେଖିଲେଓ ଏହି ମନ୍ତ୍ରେର ଏକଟି ବିଶେଷ ମାର୍ଗକତା ଉପଲବ୍ଧ ହୟ । ବନ୍ଦନ-ମୋଚନେର ଜୟ, ଶୁନଃଶେପ, ଏକେ ଏକେ ବହୁ ଦେବତାର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାଇଲେନ । ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାଇତେ ଜାନାଇତେ, ପରିଶେଷେ ସଥନ ସ୍ଵରୂପ-ତତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧ ହଇଲ, ତଥନ ତାହାର ଭେଦଭାବ ଦୂରେ ଗେଲ । ପ୍ରଥମେ ତିନି ଦେବତାବିଶେଷକେ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅପ୍ରଧାନ ଭାବିଯା ଅର୍ଚନା କରିଯାଛିଲେନ; ଏଥନ ତିନି ସକଳକେଇ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଯା ପ୍ରଗତି ଜାନାଇଲେନ । ଏହି ଭାବଇ ବନ୍ଦନ-ମୋଚନେର ମୂଳୀଭୂତ । ଶୁନଃଶେପ କେନ, ସଂସାରେ ସକଳ ସାଧକେରଇ ଏହି ଅବସ୍ଥା । ବନ୍ଦନ-ମୋଚନ ଏଇରୂପେଇ ମାଧିତ ହୟ । ସର୍ବକାଳେ ସର୍ବଲୋକେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଇ ସାର ଶିକ୍ଷା ବଲିଯା ଗୁହୀତ ହିଲ୍ଲା ଆସିତେଛେ ଓ ଆସିବେ । 'ବେଦ ଯେ ଅର୍ପୋରମ୍ୟେ, ବେଦ ଯେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ବେଦ ଯେ ଆଜ୍ଞାନ-ସାଧକ,—ଏ ମନ୍ତ୍ର ତାହାଇ ଶ୍ରୋତନା କରିତେଛେ । ମନ୍ତ୍ରେର ତାଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନ;—'ହେ ଦେବଗଣ ! ସତକ୍ଷଣ ଆମାର ପ୍ରାଣ ଥାକିବେ, ସତକ୍ଷଣ ଆମାର ଶକ୍ତି ଥାକିବେ, ତତକ୍ଷଣ ଯେନ ଆମି ସକଳ ଦେବତାର ପ୍ରତିଇ ସମଭାବେ ଅନୁରକ୍ତ ହେ । ଆମି ଦୀନାତିଦୀନ ଅତି ହୀନ; ସକଳେଇ ଆମାର ଅପେକ୍ଷା ଗରିଷ୍ଠ; ଆମି ଯେନ ସକଳକେଇ ପୁଜା କରିତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାକି,—ତାହାଦେର କାହାରେ ସହିତ ଆମାର ମସକ୍କ ଯେନ ବିଚିନ୍ତନ ନା ହୟ ।' ଦେବତାର ସକଳ ସଦ୍ଭାବ ଯେନ ମାନୁଷେ ସଞ୍ଚାତ ହୟ,—ମନ୍ତ୍ରେର ଇହାଇ ମର୍ମ ।

— • —

